বাংলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

২০১০ সাল থেকে শেখ হাসিনা সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে আসছে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারির ১ তারিখেই শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে পাঠ্যপুস্তক হাতে পায়। ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। জানুয়ারির ১ তারিখ এখন পরিণত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে। ২০১০ থেকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৪০০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯১১টি বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
তাসমিয়া নওরীন
ত ন ম জাকিয়া বারিরা
প্রণয় ভূঞাঁ
মোহাম্মদ ইউসুফ
ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ

সৈয়দ ফিদা হোসেন

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

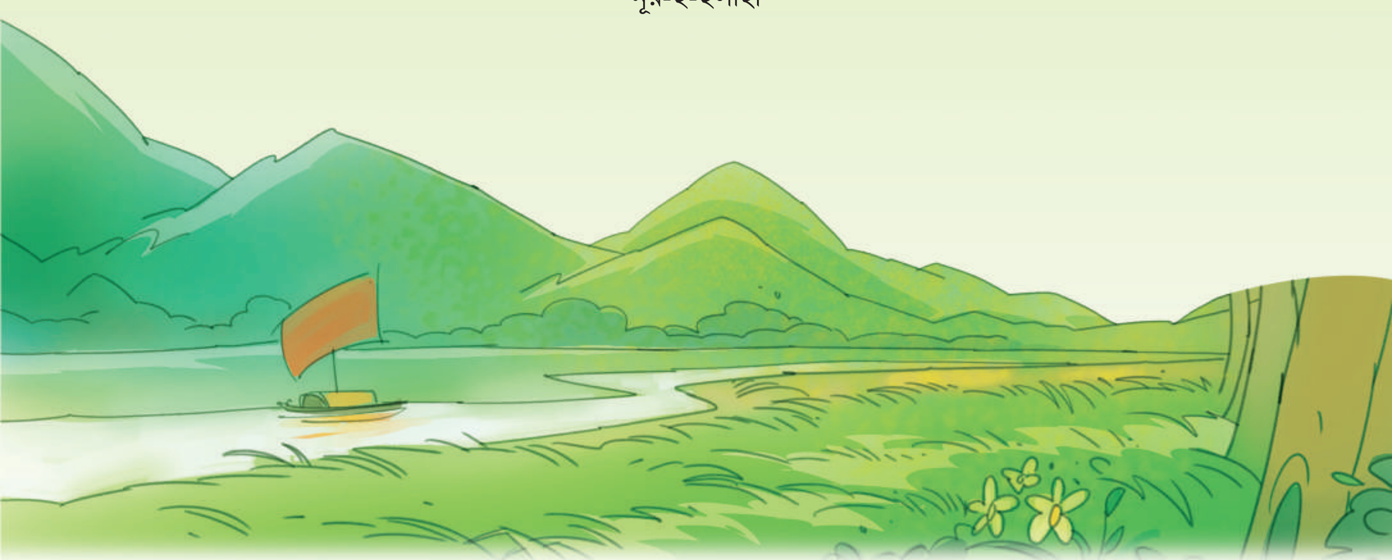

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বইটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রমিত বাংলা ভাষায় ভালোভাবে যোগাযোগ করতে শেখে। বিষয়টি মাথায় রেখে পাঠ্যবইয়ের বিন্যাস ঠিক করা হয়েছে এবং পাঠ নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নিজেদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারে সেজন্য কিছু কৌশল ও কাজ যোগ করা হয়েছে। এ বইয়ের মাধ্যমে মানসম্মত ভাষা শেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার প্রধান লেখকদের লেখার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠের সংযোগ ঘনিষ্ঠ করতে ভাষা ব্যবহারে কথোপকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করা হলো। পুরো বইটি প্রমিত ভাষায় রচিত। এজন্য বাছাই-করা পাঠের মধ্যে প্রয়োজনে কিছু শব্দ-রূপের পরিবর্তন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মোট সাতটি দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর রেখে পাঠ্যবইটি রচিত। এগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের সঙ্গে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা;

২. প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারা;

৩. বাংলা ভাষায় রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা;

৪. শব্দ, অর্থ ও যতি বিবেচনায় নিয়ে নানা ধরনের বাক্য রচনা করতে পারা;

৫. প্রমিত ভাষায় বিবরণ লিখতে পারা, অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা এবং কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারা;

৬. কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা; এবং

৭. কোনো কিছু বোঝার জন্য প্রশ্ন করতে পারা, তা নিয়ে মত প্রকাশ করতে পারা এবং সেই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারা।

বইটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবে।

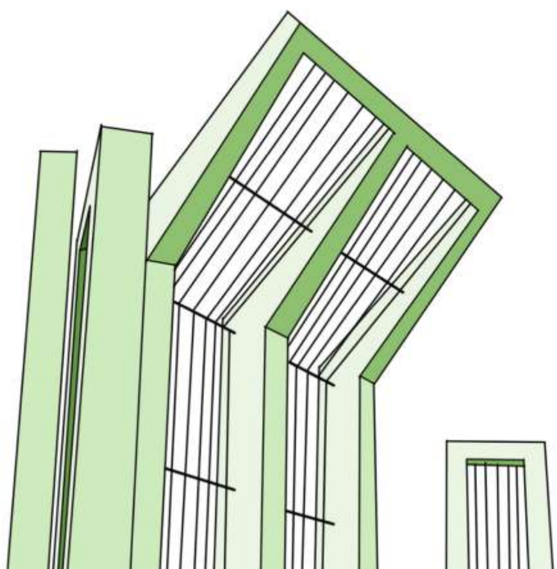

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি	১ - ৮
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রমিত ভাষা শিখি	৯ - ১৯
১ম পরিচ্ছেদ: প্রমিত ভাষা	৯ - ১৩
২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের উচ্চারণ	১৩ - ১৯
তৃতীয় অধ্যায় অর্থ বুঝে বাক্য লিখি	২০- ৫৪
১ম পরিচ্ছেদ: শব্দের শ্রেণি	২০ - ৩৮
২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের অর্থ	৩৯ - ৪৭
৩য় পরিচ্ছেদ: যতিচিহ্ন	৪৮ - ৫১
৪র্থ পরিচ্ছেদ: বাক্য	৫২ - ৫৪
চতুর্থ অধ্যায় চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই	৫৫ - ৬১
পঞ্চম অধ্যায় বুঝে পড়ি লিখতে শিখি	৬২ - ৮৮
১ম পরিচ্ছেদ: প্রায়োগিক লেখা	৬২ - ৬৫
২য় পরিচ্ছেদ: বিবরণমূলক লেখা	৬৬ - ৭০
৩য় পরিচ্ছেদ: তথ্যমূলক লেখা	৭১ - ৭৬
৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণমূলক লেখা	৭৭ - ৮২
৫ম পরিচ্ছেদ: কল্পনানির্ভর লেখা	৮৩ - ৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায় সাহিত্য পড়ি লিখতে শিখি	৮৯ - ১৩৪
১ম পরিচ্ছেদ: কবিতা	৮৯ - ১০২
২য় পরিচ্ছেদ: গান	১০৩ - ১০৬
৩য় পরিচ্ছেদ: গল্প	১০৭ - ১১৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ: প্রবন্ধ	১২০ - ১২৮
৫ম পরিচ্ছেদ: নাটক	১২৯ - ১৩১
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের নানা রূপ	১৩২ - ১৩৪
সপ্তম অধ্যায় জেনে বুঝে আলোচনা করি	১৩৫ - ১৩৯
১ম পরিচ্ছেদ: প্রশ্ন করতে শেখা	১৩৫ - ১৩৭
২য় পরিচ্ছেদ: আলোচনা করতে শেখা	১৩৮ - ১৩৯

মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি

পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ

নিচে কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ আছে। এসব পরিস্থিতিতে কী ধরনের যোগাযোগ হয়, ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো এবং ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

পরিস্থিতি ১

রাতের খাওয়া শেষে পরিবারের সবাই মিলে একসাথে কথা বলছি। সারাদিন কে কী করেছি, তা নিয়ে কথা হচ্ছে।

পরিস্থিতি ২

মায়ের সঙ্গে ছেঁড়া জুতা সেলাই করাতে গিয়েছি। একজন মুচি রাস্তার মোড়ে বসে আছেন। তাঁর সাথে আমার ও মায়ের কথা হচ্ছে।

পরিস্থিতি ৩

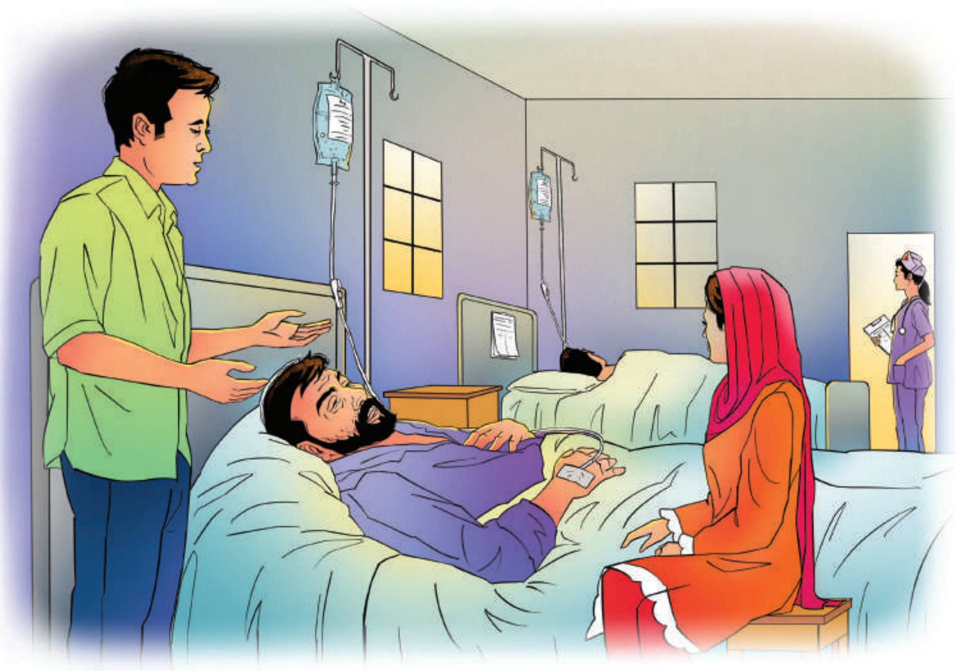

হাসপাতালে অসুস্থ আত্মীয় ভর্তি হয়ে আছেন। বাবার সঙ্গে তাঁকে দেখতে গিয়েছি এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নিচ্ছি।

পরিস্থিতি ৪

বাড়ির পাশের দোকানে এসেছি কিছু জিনিসপত্র কিনতে। দোকানদারের সাথে কথা বলছি।

পরিস্থিতি ৫

কয়েকজন বন্ধু স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। একজন অপরিচিত লোক আমাদের কাছে এসে ঠিকানা জানতে চাইলেন।

পরিস্থিতি ৬

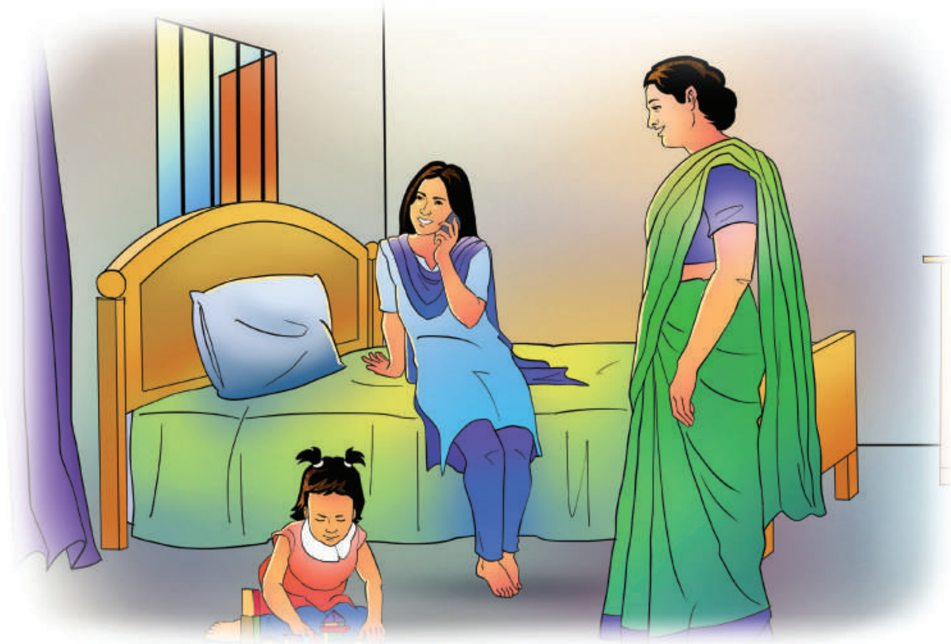

কিছুদিন অসুস্থ থাকায় স্কুলে যেতে পারিনি। শ্রেণি-শিক্ষক বাড়িতে ফোন করে আমার সাথে কথা বলছেন।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত বলে তোমার মনে হয়, সেগুলো নিচে লেখো।

ক) ______________________________

খ) ______________________________

গ) ______________________________

ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ

তুমি যেভাবে পরিবার এবং পরিবারের বাইরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করো, সে অনুযায়ী নিচের ছকটি পূরণ করো। পূরণ করা ছকের মিল-অমিল নিয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করো।

কী বলি	কাদের বলি
তুমি, তোমার, তোমাকে, তোমরা, তোমাদের	
আপনি, আপনার, আপনাকে, আপনারা, আপনাদের	
তুই, তোর, তোকে, তোরা, তোদের	
সে, তার, তাকে, তারা, তাদের	
তিনি, তাঁর, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের	
ও, ওর, ওকে, ওরা, ওদের	

নানা কারণে পরিবারের সবার সঙ্গে সবার কথা বলতে হয়। আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গেও কথা বলার দরকার হয়ে থাকে। এছাড়া সহপাঠীর সঙ্গে, শিক্ষকের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, দোকানদারের সঙ্গে, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে নানা সময়ে কথা বলার দরকার হয়। এই যোগাযোগের ধরন এক রকমের হয় না। তা ছোটোদের সাথে এক রকম, সমবয়স্কদের সাথে এক রকম, বড়োদের সাথে এক রকম, আবার অপরিচিত লোকের সাথে আর এক রকম।

নিচের বাক্যগুলো দেখো। বাক্যগুলোতে কোন কোন শব্দে পরিবর্তন হয়েছে, তা চিহ্নিত করো।

তুমি কেমন আছ?

আপনি কেমন আছেন?

তুই কেমন আছিস?

সে কেমন আছে?

তিনি কেমন আছেন?

ও কেমন আছে?

মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়া

তুমি, আপনি, তুই, সে, তিনি, ও—এগুলো সর্বনাম শব্দ। সর্বনাম শব্দ নামের বদলে বসে। সর্বনাম মূলত তিন ধরনের:

১. সাধারণ সর্বনাম
২. মানী সর্বনাম
৩. ঘনিষ্ঠ সর্বনাম

তুমি বলা যায় ভাই-বোনকে, ঘনিষ্ঠজনকে, বাবা-মাকে, বন্ধুকে। এগুলো সাধারণ সর্বনাম। আপনি করে বলতে হয় শিক্ষককে, বয়সে বড়ো আত্মীয়-স্বজনকে, অপরিচিত লোককে। এগুলো মানী সর্বনাম। কারো সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতা থাকলে অথবা কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে তুই বলা হয়। এগুলো ঘনিষ্ঠ সর্বনাম।

সর্বনামের রূপ

সাধারণ সর্বনাম	মানী সর্বনাম	ঘনিষ্ঠ সর্বনাম
তুমি, তোমার, তোমাকে তোমরা, তোমাদের	আপনি, আপনার, আপনাকে আপনারা, আপনাদের	তুই, তোরা, তোকে তোরা, তোদের
সে, তার, তাকে তারা, তাদের	তিনি, তাঁর, তাঁকে তাঁরা, তাঁদের	ও, ওর, ওকে ওরা, ওদের

বাক্যে যেসব শব্দ দিয়ে কাজ করা বোঝায়, সেগুলোকে ক্রিয়া বলে। যেমন—শোনা, বলা, পড়া, লেখা, খেলা, গাওয়া এগুলো ক্রিয়া শব্দ। মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনামের যেমন পরিবর্তন হয়, ক্রিয়ারও তেমন পরিবর্তন হয়। নিচে সর্বনাম অনুযায়ী 'করা' ক্রিয়ার কয়েকটি রূপ দেখানো হলো।

ক্রিয়ার রূপ

সাধারণ সর্বনাম	মানী সর্বনাম	ঘনিষ্ঠ সর্বনাম
তুমি করো, তুমি করছ, তুমি করেছ, তুমি করতে, তুমি করেছিলে, তুমি করবে, তুমি কোরো।	আপনি করুন, আপনি করছেন, আপনি করেছেন, আপনি করতেন, আপনি করেছিলেন, আপনি করবেন।	তুই করিস, তুই করছিস, তুই করেছিস, তুই করতিস, তুই করেছিলি, তুই করবি।
সে করে, সে করছে, সে করেছে, সে করত, সে করেছিল, সে করবে।	তিনি করেন, তিনি করছেন, তিনি করেছেন, তিনি করতেন, তিনি করেছিলেন, তিনি করবেন।	ও করে, ও করছে, ও করেছে, ও করত, ও করেছিল, ও করবে।

সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে বাক্য তৈরি

নিচের ছকের সর্বনাম অনুযায়ী যেকোনো ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করো।

সর্বনাম	ক্রিয়া	বাক্য
১. তুমি/তোমরা		
২. আপনি/আপনারা		
৩. তুই/তোরা		
৪. সে/তারা		
৫. তিনি/তাঁরা		
৬. ও/ওরা		

ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ

মানুষ নানা প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ মূলত দুইভাবে হয়:

১. ভাষিক যোগাযোগ
২. অভাষিক যোগাযোগ

ভাষিক যোগাযোগ: ভাষিক যোগাযোগের প্রধান রূপ চারটি— শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এর মধ্যে বলা ও শোনার কাজে মুখ ও কানের ভূমিকা প্রধান। যন্ত্র থেকে তৈরি শব্দও আমরা কান দিয়ে শুনে থাকি। অন্যদিকে লেখা ও পড়ার কাজে হাত ও চোখ প্রধান ভূমিকা রাখে। যন্ত্রে লেখা শব্দও আমরা চোখ দিয়ে পড়তে পারি। কথা বলা, বই পড়া, ফোনে আলাপ করা ও বার্তা পাঠানো, রেডিও-টেলিভিশন শোনা ও দেখা, কাগজে লেখা বা কম্পিউটারে টাইপ করা ইত্যাদি ভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ।

অভাষিক যোগাযোগ: যোগাযোগের ক্ষেত্রে কথা বলা ও লেখার পাশাপাশি কিছু অভাষিক কৌশলও কাজে লাগানো হয়। তখন মুখভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, হাত ও চোখের ইশারা, হাতের স্পর্শ, ছবি ও সংকেত ইত্যাদির ব্যবহার হয়।

যোগাযোগের অনুশীলন

এবার দলে ভাগ হয়ে নিচের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভূমিকাভিনয় করো। কথোপকথনের সময়ে খেয়াল রাখবে মর্যাদা অনুযায়ী যেন সর্বনাম ও ক্রিয়ার ব্যবহার হয়।

১. বাইরে থেকে মাত্র বাড়ি ফিরেছ। এমন সময়ে তোমার ছোটো ভাই তোমার সাথে খেলার জন্য বায়না ধরেছে। এ নিয়ে তার সাথে কথা হচ্ছে।

২. আজ নতুন বই হাতে পেয়েছ। খবরটি তোমার দাদা বা নানাকে ফোন করে জানাও।

৩. তোমার চাচা টেলিফোন করে জানালেন, তোমার দাদি অসুস্থ। এ নিয়ে চাচার সঙ্গে আলাপ করছ।

৪. বাসার কাছের দোকানে খাতা ও কলম কিনতে গিয়েছ। সবগুলো জিনিস কেনা শেষে দেখা গেল, তোমার কাছে কিছু টাকা কম পড়েছে। এ নিয়ে দোকানির সাথে কথা বলছ।

৫. তোমার ক্লাসে একজন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তুমি তার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছ এবং তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছ।

৬. পাশের বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তুমি দাওয়াত পেয়েছ। সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলছ।

জরুরি যোগাযোগ

অনেক সময়ে জরুরি প্রয়োজনে কারো সঙ্গে বা কোনো সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। নিচে কিছু জরুরি পরিস্থিতি দেওয়া হলো। এমন পরিস্থিতিতে তুমি বা তোমরা কার সাথে যোগাযোগ করবে তা নিচে লেখো।

জরুরি পরিস্থিতি	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে
১. তোমার এলাকার কোনো বাড়িতে আগুন লেগেছে।	
২. খেলার মাঠে এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।	
৩. ঝড়ের পরে বিদ্যুতের তার রাস্তায় পড়ে আছে।	
৪. হারিয়ে যাওয়া কোনো শিশুকে খুঁজে পাওয়া গেছে।	

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমিত ভাষা শিখি

•১ম পরিচ্ছেদ

প্রমিত ভাষা

নিচে কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ আছে। এসব পরিস্থিতিতে তোমার বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের লোকজন, কিংবা এলাকার মানুষ যেভাবে কথা বলে, তা কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

১. খেলার সময়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে।

২. পড়াশোনা কেমন চলছে তা নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছে।

৩. সবজি কিনতে গিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরাদরি হচ্ছে।

উপরের পরিস্থিতিগুলোতে যে ভাষায় কথা বলেছ, নিচের ক্ষেত্রে তা আলাদা কি না, তা নিয়ে আলোচনা করো।

৪. রেডিও-টেলিভিশনে পঠিত সংবাদ ও প্রতিবেদনের ভাষা

৫. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের ভাষা

৬. পাঠ্যবইয়ের ভাষা

প্রথমে দেওয়া পরিস্থিতি তিনটিতে তোমরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছ, কিংবা কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ এমনভাবে করেছ, যা পরের ক্ষেত্র তিনটির সাথে মেলে না। নিচের ছক অনুযায়ী এমন কিছু শব্দের তালিকা করো। ধরা যাক, 'টাকা' শব্দটি তোমরা 'টাহা' বলেছ। সেক্ষেত্রে নিচের ছকের বাম কলামে 'টাহা' এবং ডান কলামে 'টাকা' লিখতে হবে।

বাম কলাম	ডান কলাম
টাহা	টাকা

আঞ্চলিক ভাষা ও প্রমিত ভাষা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষায় ভিন্নতা আছে। যেমন—যশোর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের মানুষ একভাবে কথা বলে না। 'ছেলে' শব্দটিকে কোনো অঞ্চলের মানুষ বলতে পারে 'পুত', কোনো অঞ্চলে 'ব্যাটা', কোনো অঞ্চলে 'পোলা'। এভাবে অঞ্চলভেদে অনেক শব্দই বদলে যায়। কখনো কখনো শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ঘটে। যেমন, 'ছেলে' শব্দটি উচ্চারিত হতে পারে 'চেলে' বা 'শেলে'। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষার এই রূপভেদকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা।

আঞ্চলিক রূপের জন্য এক অঞ্চলের মানুষের কথা আর এক অঞ্চলের মানুষের বুঝতে সমস্যা হয়। এ কারণে, সব অঞ্চলের মানুষের সহজে বোঝার জন্য ভাষার একটি রূপ নির্দিষ্ট হয়েছে, তাকে প্রমিত ভাষা বলে।

ধ্বনির উচ্চারণ

নিচের জোড়া শব্দগুলো উচ্চারণ করো। প্রতি জোড়া শব্দের প্রথম ধ্বনিতে পার্থক্য আছে। এটা উচ্চারণের সময়ে খেয়াল করবে। জোড়ার প্রথম শব্দের প্রথম ধ্বনিটি উচ্চারণ করতে মুখ থেকে অল্প বাতাস বের হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনিটি উচ্চারণ করতে বেশি বাতাস বের হয়। যেমন: 'কই' শব্দের ক এবং 'খই' শব্দের খ। শব্দগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখের সামনে এক টুকরা কাগজ ধরে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

কই - খই	কোল - খোল	গোড়া - ঘোড়া	গড়ি - ঘড়ি
চাল - ছাল	চাপ - ছাপ	জাল - ঝাল	জুড়ি - ঝুড়ি
টুক - ঠুক	টোকা - ঠোকা	ডাল - ঢাল	ডাক - ঢাক
তালা - থালা	তাক - থাক	দান - ধান	দুম - ধুম
পুল - ফুল	পিতা - ফিতা	বান - ভান	বোল - ভোল

উচ্চারণ ঠিক রেখে ছড়া পড়ি

ছড়া পড়তে নিশ্চয় তোমাদের ভালো লাগে। এখানে একটি ছড়া দেওয়া হলো। ছড়াটির নাম ‘চিঠি বিলি’। এটি লিখেছেন রোকনুজ্জামান খান। ছড়াটি নেওয়া হয়েছে তাঁর ‘হাট্ টিমা টিম’ নামের বই থেকে। রোকনুজ্জামান খান ‘দাদাভাই’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে শিশু-কিশোরদের জন্য ‘কচিকাঁচার মেলা’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

ছড়াটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো।

চিঠি বিলি

রোকনুজ্জামান খান

ছাতা মাথায় ব্যাঙ চলেছে
চিঠি বিলি করতে,
টাপুস টুপুস ঝরছে দেয়া
ছুটছে খেয়া ধরতে।
খেয়ানায়ের মাঝি হলো
চিংড়ি মাছের বাচ্চা,
দু চোখ বুজে হাল ধরে সে
জবর মাঝি সাচ্চা।
তার চিঠিও এসেছে আজ
লিখছে বিলের খলসে,
সাঁঝের বেলার রোদে নাকি
চোখ গেছে তার ঝলসে।
নদীর ওপার গিয়ে ব্যাঙা
শুধায় সবায়: ভাইরে,
ভেটকি মাছের নাতনি নাকি
গেছে দেশের বাইরে?
তার যে চিঠি এসেছে আজ
লিখছে বিলের কাতলা:
এবার সারা দেশটি জুড়ে

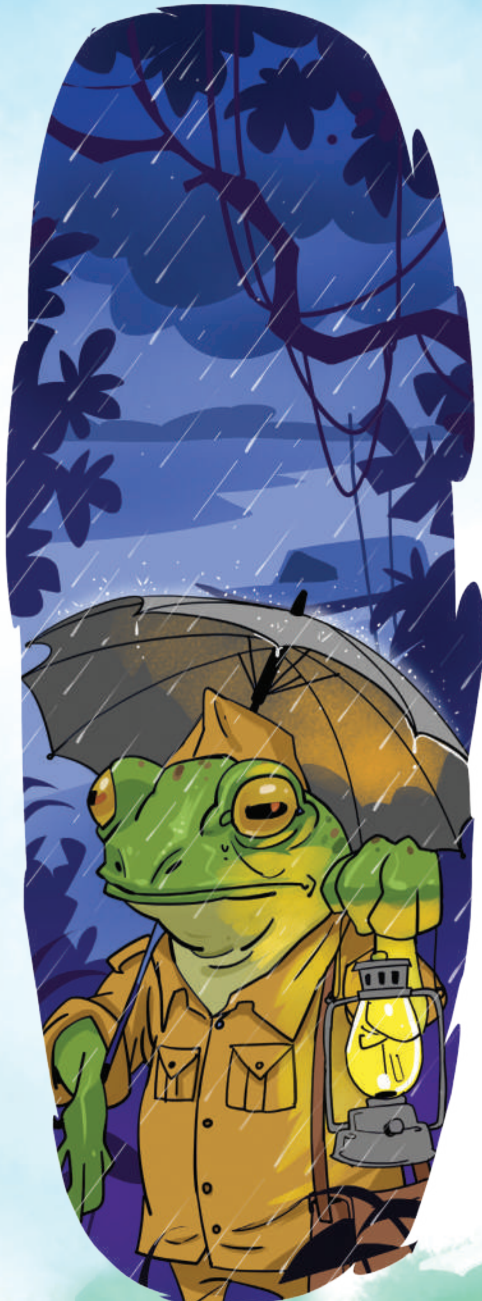

নামবে দারুণ বাদলা।
তাই তো নিলাম ছাতা কিনে
আসুক এবার বর্ষা,
চিংড়ি মাঝির খেয়া না আর
ছাতাই আমার ভরসা।

শব্দের অর্থ

কাতলা: মাছের নাম।

খলসে: মাছের নাম।

খেয়া: নদী পার হওয়ার নৌকা।

খেয়া না: খেয়া নৌকা।

খেয়ানায়ের মাঝি: খেয়া নৌকার মাঝি।

চিঠি: কোনো খবর জানিয়ে লেখা কাগজ।

চিঠি বিলি করা: চিঠি পৌঁছে দেওয়া।

ঝলসানো: উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধানো।

টাপুস টুপুস: বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

দেয়া: বৃষ্টি।

বাদলা: একনাগাড়ে বৃষ্টি।

ভরসা: নির্ভর করা, অবলম্বন।

ভেটকি: মাছের নাম।

সাঁঝের বেলা: সন্ধ্যার সময়।

সাচ্চা: সত্য।

শব্দ খুঁজি

অনেক শব্দ তোমার অঞ্চলের মানুষ ভিন্নভাবে উচ্চারণ করে। আবার, অনেক প্রমিত শব্দের বদলে তোমার অঞ্চলের মানুষ আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। এ রকম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছক অনুযায়ী তালিকা করো।

আঞ্চলিক উচ্চারণ/শব্দ	প্রমিত শব্দ

প্রমিত ভাষার চর্চা করি

এই পরিচ্ছেদ শুরুর পরিস্থিতি তিনটিতে যেভাবে কথোপকথন হয়েছে, সেই কথাগুলো এবার প্রমিত ভাষায় বলার চেষ্টা করো।

১. খেলার সময়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে।

২. পড়াশোনা কেমন চলছে তা নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছে।

৩. সবজি কিনতে গিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরাদরি হচ্ছে।

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দের উচ্চারণ

নিচে একটি নাটক দেওয়া হলো। নাটকটির নাম 'সুখী মানুষ'। এটি মমতাজউদদীন আহমদের লেখা। তিনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর লেখা বিখ্যাত নাটকের মধ্যে আছে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'কি চাহ শঙ্খচিল'।

যাঁরা নাটক লেখেন, তাঁদের নাট্যকার বলে। নাটকে একজনের সঙ্গে অন্যজনের যেসব কথা হয়, সেগুলোকে সংলাপ বলে। এই নাটকের সংলাপে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথা বা সংলাপ যাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তাদের বলে চরিত্র।

'সুখী মানুষ' নাটকে অনেকগুলো চরিত্র আছে। তুমি ও তোমার সহপাঠীরা এগুলোর মধ্য থেকে একটি করে চরিত্র বেছে নাও এবং চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ পাঠ করো। সংলাপ পাঠ করার সময়ে প্রমিত উচ্চারণের দিকে খেয়াল রেখো।

সুখী মানুষ

মমতাজউদদীন আহমদ

নাটকের চরিত্র	মোড়ল	কবিরাজ	হাসু	রহমত	লোক
	বয়স ৫০	বয়স ৬০	বয়স ৪৫	বয়স ২০	বয়স ৪০

প্রথম দৃশ্য

[মোড়লের অসুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে।]

হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।

রহমত : শুনছি।

হাসু : ভালো করে শোনো, ওই কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিস্তার নাই।

রহমত : অমন ভয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব।

হাসু : কাঁদো, মন উজাড় করে কাঁদো। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক। আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড়ো জ্বালিয়েছে । এর গোরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে।

রহমত : তাই বলে মোড়লের ব্যারাম ভালো হবে না কেন?

হাসু : হবেই না তো। মোড়ল যে অত্যাচারী, পাপী। মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না। দেখে নিও, মোড়ল মরবে।

রহমত : আর আজে-বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!

কবিরাজ : এত কোলাহল কোরো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।

রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে? মোড়ল বাঁচবে তো!

কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বোলো না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি, মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ করো।

হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই।

রহমত : মোড়ল আমার মনিব।

কবিরাজ : এই নিষ্ঠুর মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।

হাসু : বাঘের চোখ আনতে হবে?

কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ।

রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?

কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না।

মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও।

কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।

[রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে।]

হাসু : ওই মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।

মোড়ল : ভাই হাসু, এদিকে এসো, আমি সব দিয়ে দেবো। আমাকে শান্তি এনে দাও।

কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কি আর কোনো দিন মিথ্যা কথা বলবে?

মোড়ল : আর বলব না। এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।

কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?

মোড়ল : না। লোভ করব না, অত্যাচার করব না। আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।

কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাকো, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।

মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।

হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।

মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড়ো বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?

কবিরাজ : চুপ করো। যত কোলাহল করবে, তত দুঃখ বাড়বে। হাসু এদিকে এসো, আমার কথা শ্রবণ করো। মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি আজ রাত্রির মধ্যেই—

রহমত : যদি কী?

কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই

হাসু : কী করতে হবে?

কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পারো।

রহমত : ফতুয়া?

কবিরাজ : হ্যাঁ, জামা। এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাৎ তার হাড়-মড়মড় রোগ ভালো হবে।

রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।

কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখো। সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল বাঁচবে না।

মোড়ল : আমি বাঁচব। জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেবো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোটো একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]

রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।

হাসু : আর তো সময় নেই ভাই, এখন বারোটা। সুখী মানুষ নেই, সুখী মানুষের জামাও নেই। মোড়ল তো তাহলে এবার মরবে।

রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—

হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড়ো কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও। শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।

রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।

হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।

হাসু : এই যে ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এসো।

রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো।]

লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?

হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?

লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।

হাসু : অ্যাঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?

লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে-দেয়ে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।

হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?

লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?

হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?

[লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে।]

রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!

লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।

হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ!

লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড়ো বাদশা।

রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশো টাকা দেবো। জামাটা নিয়ে এসো।

লোক : জামা!

রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশো টাকা দেবো। জামাটা নিয়ে এসো, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।

লোক : আমার তো কোনো জামা নেই ভাই!

হাসু : মিছে কথা বোলো না।

লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নেই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

শব্দের অর্থ

অত্যাচারী: যে অত্যাচার করে।

অমর: যার মৃত্যু নেই।

আত্মীয়: পরিবারের ঘনিষ্ঠজন।

কবিরাজ: যিনি চিকিৎসা করেন।

কুঁড়েঘর: খড় দিয়ে ছাওয়া ছোটো ঘর।

কোলাহল করা: বহু লোকের একসাথে কথা বলা।

চাকর: কর্মচারী।

ছটফট করা: অস্থির হয়ে নড়াচড়া করা।

জবরদস্তি করা: জোর করা।

তৎক্ষণাৎ: সেই সময়ে।

তাজ্জব কথা: অবাক করা কথা।

দৃশ্য: নাটকের অংশ।

নক্ষত্র: আকাশের তারা।

নাড়ি পরীক্ষা করা: রোগ নির্ণয় করা।

নিষ্ঠুর: যার মনে মায়া-মমতা কম।

নিস্তার: রক্ষা।

পাপী: যে পাপ করে।

প্রতিজ্ঞা করা: ওয়াদা করা।

ফতুয়া: জামা।

বখশিশ: খুশি হয়ে দেওয়াউপহার।

বাঘের চোখ আনা: কঠিন কাজ করা।

বিশ্বাসী: যাকে বিশ্বাস করা যায়।

ব্যামো: অসুস্থতা।

ব্যারাম: অসুস্থতা।

মন উজাড় করে কাঁদা: ইচ্ছামতো কাঁদা।

মানুষকে জ্বালানো: মানুষকে কষ্ট দেওয়া।

মূর্খ: বোকা।

মোড়ল: গ্রামের প্রধান।

ম্লান আলো: সামান্য আলো।

শ্রবণ করা: শোনা।

হাড়-মড়মড় রোগ: রোগের নাম।

হিমালয়: পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম।

শব্দের উচ্চারণ

প্রমিত ভাষায় শব্দের উচ্চারণ ঠিকমতো করতে হয়। 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে কিছু শব্দ বাম কলামে দেওয়া হলো। শব্দগুলোর উচ্চারণ কেমন হবে, তা ডানের কলামে লিখে দেখানো হয়েছে। তোমার উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না, এখান থেকে মিলিয়ে নাও।

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
অত্যাচারী	ওত্তাচারি
অন্ধকার	অন্‌ধোকার্
অসুখ	অশুখ্
অসুখী	অশুখি
আত্মীয়	আত্‌তিঁয়ো
একলা	অ্যাক্‌লা
একশো	অ্যাক্‌শো
কবিরাজ	কোবিরাজ্
কুঁড়েঘর	কুঁড়েঘর্
ঘুম	ঘুম্
চাকর	চাকোর্
চাল	চাল্
তৎক্ষণাৎ	তত্‌খনাত্
তাজ্জব	তাজ্‌জোব্
দুঃখী	দুক্‌খি

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
দুনিয়া	দুনিয়া
পাগল	পাগোল্
বখশিশ	বোখ্‌শিশ্
বাজার	বাজার্
বিশ্বাসী	বিশ্‌শাশি
ভিক্ষা	ভিক্‌খা
ভিখারি	ভিখারি
মস্ত	মস্‌তো
মানুষ	মানুশ্
মিথ্যা	মিত্‌থা
মোড়ল	মোড়োল্
সত্যি	শোত্‌তি
সুখী	শুখি
সোজা	শোজা
সোনাদানা	শোনাদানা

উপস্থিত বক্তৃতায় প্রমিত ভাষার চর্চা

তোমরা প্রত্যেকে একটি করে বিষয় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দাও। একেকটি বিষয় নিয়ে একেক জনকে এক মিনিট করে কথা বলতে হবে। কথা বলার সময়ে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করো।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ বুঝে বাক্য লিখি

•১ম পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণি

নমুনা ১

হাবিব সোমবার সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছাল। সে রবিবার রাতের ট্রেনে তার বড়ো বোনের সাথে রাজশাহী থেকে রওনা দিয়েছিল। এই প্রথম সে ঢাকায় এসেছে। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে বোনের বাসায় যাওয়ার পথে ফ্লাইওভার দেখে হাবিব অবাক হয়ে গেল। এটাকে তার মনে হলো দোতলা রাস্তা। বোনের বাসার কাছে রাস্তার পাশে একটি ফুলের দোকান। সেখানে রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা-সহ নানা রকম ফুল থরে থরে সাজানো রয়েছে। তার ঠিক পাশেই একটা ফলের দোকান। সেখান থেকে বড়ো বোন কিছু পেয়ারা কিনল। ঘরে ঢোকার পর পরিবারের সবার সাথে কুশল বিনিময় হলো। টেবিলে নাশতা দেওয়া ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে সে নাশতা করতে বসল। সেদিন ছিল বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট খেলা। তাই খাওয়া শেষ করেই টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসল। ভ্রমণের কারণে হাবিবের কিছুটা ক্লান্তি ছিল, তবে সব মিলিয়ে তার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

উপরের নমুনা থেকে নাম বোঝায় এমন শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

______	______	______
______	______	______
______	______	______
______	______	______

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

বিশেষ্য

বাক্যে যেসব শব্দ দিয়ে কোনো নাম বোঝায় সেগুলোকে বিশেষ্য বলে। অনেক রকম বিশেষ্য রয়েছে, যেমন—

মানুষ, জায়গা ইত্যাদির নাম: রাসেল , ঢাকা, গীতাঞ্জলি।

একই জাতের কাউকে বা কোনোটিকে বোঝায় এমন নাম: শিক্ষক, নদী, গাছ।

কোনো জিনিসের নাম: ইট, চেয়ার, বই।

একত্রে থাকা বোঝায় এমন নাম: জনতা, বাহিনী, মিছিল।

কোনো গুণের নাম: সরলতা, মাধুর্য, দয়া।

কোনো কাজের নাম: ভোজন, শয়ন, পড়ানো।

পাঠ থেকে বিশেষ্য খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে বিশেষ্য শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	বিশেষ্য শব্দ
'চিঠি বিলি' থেকে পাওয়া	
'সুখী মানুষ' থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে বিশেষ্য খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে বিশেষ্য শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ২

পারুল ফোন করে জানাল, তার প্রিয় একটা বই হারিয়ে গেছে। সেটি টেবিলের উপরে রাখা ছিল। শাহেদ সেখান থেকে বইটা নিয়েছে বলে তার সন্দেহ হয়। তবে ঠিক কে নিয়েছে, পারুল সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। সন্দেহের তালিকায় মিনু আর চিনুর নামও আছে। পারুলের ধারণা, ওরাও বইটা নিতে পারে।

সব শুনে আমি বললাম, কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। যে নিয়েছে, সে হয়তো পড়ার জন্যই নিয়েছে। কয়েক দিন অপেক্ষা করে দেখো, বইটা পাওয়া যায় কি না!

কিছু দিন পরে পারুল নিজেই জানাল, বইটা পাওয়া গেছে। পারুলের বাবা বইটা বুকশেলফে তুলে রেখেছিলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি, এক বই নিয়ে এত ঘটনা ঘটে যাবে। আর পারুলও না বুঝে অন্যদের দোষ দিচ্ছিল!

উপরের নমুনা থেকে বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এমন শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

______	______	______
______	______	______
______	______	______
______	______	______

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

সর্বনাম

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে সর্বনাম বলে। বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে ভূমিকা পালন করে, সর্বনাম অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। যেমন: শিমুল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করেছে। দ্বিতীয় বাক্যের ‘সে’ প্রথম বাক্যের ‘শিমুল’-এর পরিবর্তে বসেছে।

পাঠ থেকে সর্বনাম খুঁজি

‘চিঠি বিলি’ ছড়া ও ‘সুখী মানুষ’ নাটক থেকে সর্বনাম শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	সর্বনাম শব্দ
‘চিঠি বিলি’ থেকে পাওয়া	
‘সুখী মানুষ’ থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে সর্বনাম খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে সর্বনাম শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৩

নীল-সাদা স্কুলজামা পরে কয়েকটি মেয়ে স্কুল থেকে ফিরছিল। মেঠো পথের দুপাশে সবুজ ধানখেত। হঠাৎ সামনের মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, কী সুন্দর একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে!'

পাশের মেয়েটি উপরে তাকিয়ে কোনো পাখি দেখতে পেল না। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে শুধু সাদা মেঘ ভেসে যেতে দেখল। অন্যরাও সেই পাখিটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে উড়ন্ত পাখিটা চোখের আড়াল হয়ে গেছে।

ধানখেত পার হতেই একটা বড়ো পুকুর। সেখানকার পানি টলটলে। পুকুরের ধারে একটা বড়ো আমগাছ। সেই আমগাছের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এবার অনেক আম ধরবে!' সবাই তাকিয়ে দেখল, আমগাছে প্রচুর মুকুল এসেছে। সাদা মুকুলে আমগাছের সবুজ পাতা ঢাকা পড়েছে।

গাছের নিচে একজন বয়স্ক লোক পুরানো চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর বয়স কম-বেশি সত্তর বছর। তিনি ওদের কথা শুনে বললেন, 'ও ঠিকই বলেছে। যে বছর ধান ভালো হয়, সে বছর আমের ফলনও ভালো হয়।'

কিছু শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়। উপরের নমুনা থেকে এ ধরনের শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

বিশেষণ

যে শব্দ দিয়ে বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা বোঝায়, তাকে বিশেষণ শব্দ বলে। যেমন: লাল ফুল, ভালো কথা, দশ টাকা, লক্ষ জনতা, টাটকা সবজি। এখানে দাগ দেওয়া শব্দগুলো বিশেষণ।

পাঠ থেকে বিশেষণ খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে বিশেষণ শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	বিশেষণ শব্দ
'চিঠি বিলি' থেকে পাওয়া	
'সুখী মানুষ' থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে বিশেষণ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে বিশেষণ শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৪

সবাই যখন খেলে, রিনার ভাই রাজীব তখন পড়তে বসে। আবার সবাই যখন পড়তে বসে, রাজীব তখন ঘুমায়। আর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, রাজীব তখন খেলে। আজকাল কী যে করছে ছেলেটা! বয়স সবে চার বছর পূর্ণ হলো। সবকিছুতেই তার এলোমেলো আচরণ। বাবা একদিন কথায় কথায় মাকে বললেন, 'আচ্ছা, ছেলেটার সব কাজ এমন এলোমেলো হচ্ছে কেন?' মা হেসে বললেন, 'কোথায়! সব কাজ তো এলোমেলো হচ্ছে না। এই যেমন, আমি খাইয়ে দিলে রাজীব সময়মতো খায়।' মার কথা শুনে বাবা হাসলেন। বললেন, 'আরেকটু বড়ো হলে কী করবে, সেটাই দেখার বিষয়।' মা বললেন, 'বড়ো হলে সব বুঝতে শিখবে। তখন সময়মতো পড়বে, ঘুমাবে, আর খেলবে।'

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে কাজ করা বোঝায় এমন শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

______	______	______
______	______	______
______	______	______
______	______	______

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

ক্রিয়া

যেসব শব্দ দিয়ে করা বা হওয়া বোঝায়, সেগুলোকে ক্রিয়া বলে। যেমন: সুমি <u>খেলছে</u>। সূর্য <u>ডুবে গিয়েছে</u>। এখানে দাগ দেওয়া শব্দগুলো ক্রিয়া।

পাঠ থেকে ক্রিয়া খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে ক্রিয়া শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	ক্রিয়া শব্দ
‘চিঠি বিলি’ থেকে পাওয়া	
‘সুখী মানুষ’ থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে ক্রিয়া খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে ক্রিয়া শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৫

তুমি জোরে দৌড়াও, আমি ধীরে হাঁটি।

তুমি সামনে যাও, আমি পিছনে থাকি।

তুমি থামবে না, আমিও দাঁড়াব না।

তুমি ঠিকঠাক যাও, আমি চুপচাপ দেখি।

তোমাকে কানে কানে বলি, আমি ভয়ে ভয়ে আছি।

কিছু শব্দ দিয়ে ক্রিয়ার গতি, সময় ইত্যাদি বোঝায়। উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এ ধরনের শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

ক্রিয়াবিশেষণ

যে শব্দ দিয়ে ক্রিয়ার গতি, সময় ইত্যাদি বোঝায়, সেগুলোকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন: ছেলেটি তাড়াতাড়ি হাঁটে। লোকটি সামনে এগিয়ে গেল। মেয়েরা এখান থেকে যাবে না। এখানে দাগ দেওয়া শব্দগুলো ক্রিয়াবিশেষণ।

পাঠ থেকে ক্রিয়াবিশেষণ খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ
'চিঠি বিলি' থেকে পাওয়া	
'সুখী মানুষ' থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে ক্রিয়াবিশেষণ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৬

তিশার দাদির কাছে একটা পুরাতন সিন্দুক আছে। সেই সিন্দুক সবসময়ে তালা দিয়ে আটকানো থাকে। সিন্দুকের চাবি গেছে হারিয়ে; তাই বহুদিন ধরে ওটা খোলা হয় না। তিশা ওর দাদিকে গিয়ে বলল, 'দাদি, এই সিন্দুকের ভেতরে কী আছে?'

দাদি অবাক চোখে তিশার দিকে তাকালেন। তারপর তিশাকে পাশে বসালেন। বললেন, 'এর মধ্যে আমার শাশুড়ির, আমার, আর তোমার মার অনেক গয়না আছে। চাবি দিয়ে তালা খোলার পর সব দেখতে পাবে।' এই বলে তিনি বাজার থেকে চাবি বানানোর লোক আনালেন। তিশার জন্য সিন্দুক খোলা হলো।

কিছু শব্দ অন্য শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এ ধরনের শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

অনুসর্গ

যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসিয়ে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে। যেমন: মাথার উপরে নীল আকাশ। সে ঢাকা থেকে বরিশালে গেল। এখানে দাগ দেওয়া শব্দগুলো অনুসর্গ।

পাঠ থেকে অনুসর্গ খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে অনুসর্গ শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	অনুসর্গ শব্দ
'চিঠি বিলি' থেকে পাওয়া	
'সুখী মানুষ' থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে অনুসর্গ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে অনুসর্গ শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৭

পলাশের নানা ও নানি একইদিনে মারা যান। নানার কঠিন অসুখ হয়েছিল এবং ওই অসুখে তিনি কয়েক বছর ভুগেছিলেন। নানা মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর পলাশের নানির হার্ট-অ্যাটাক হয়। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বাঁচানো যায়নি। তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন পলাশের মন খুব খারাপ ছিল; তাই তখন সে কারও সাথে কথা বলত না। পলাশ একসময়ে বুঝতে পারে, মানুষের বার্ধক্য আর মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। তবু প্রতিটি মৃত্যু মানুষকে কষ্ট দেয়। পলাশদের বাড়িতে যখন নানা বা নানি বেড়াতে আসতেন, তখন পলাশের খুব ভালো লাগত। কারণ, তাঁরা পলাশকে খুব আদর করতেন। তাছাড়া তাঁরা পলাশের সঙ্গে অনেক মজার মজার গল্পও করতেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এমন শব্দ খুঁজে বের করো যেগুলো শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করেছে। বের করা শব্দগুলো নিচের খালি জায়গায় লেখো।

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

যোজক

শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে যেসব শব্দ, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

পাঠ থেকে যোজক খুঁজি

‘চিঠি বিলি’ ছড়া ও ‘সুখী মানুষ’ নাটক থেকে যোজক শব্দ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	যোজক শব্দ
‘চিঠি বিলি’ থেকে পাওয়া	
‘সুখী মানুষ’ থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে যোজক খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে যোজক শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৮

শেষ বলে ছয় মেরে বাংলাদেশ জিতে গেল। আমি বললাম, ‘আহ্! কী চমৎকার খেলাই না দেখলাম!’

ছোটো বোন চিৎকার দিয়ে উঠল, ‘দারুণ! আমরা জিতে গেছি।’ ওর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক।

মা বললেন, ‘বাহ্, এমন খেলা বহুদিন দেখিনি। ছেলেরা ভালোই খেলেছে।’

বাবা বললেন, ‘শাবাশ! এই না হলে বাঘের বাচ্চা!’

‘আহা! যারা হেরে গেল, ওদের মনে অনেক কষ্ট। তাই না?’ ছোটো বোন একটা ফোড়ন কাটল।

বাবা হাসলেন। বললেন, ‘দুর! এতে কষ্টের কী আছে? এটা তো একটা খেলা। খেলায় হারজিত থাকতেই পারে।’

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, ‘আরে! এর মধ্যেই দেখি বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেছে।’

বোন সেদিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাপরে বাপ! কত বড়ো মিছিল!’

মনের আবেগে হঠাৎ করে কিছু শব্দ আমরা উচ্চারণ করে থাকি। উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এ ধরনের শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

আবেগ

মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলে। এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলো থেকে খানিকটা আলগাভাবে বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ছি ছি , আহা, বাহ্, শাবাশ, হায় হায় ইত্যাদি।

পাঠ থেকে আবেগ খুঁজি

'চিঠি বিলি' ছড়া ও 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে আবেগ শব্দ খোঁজ করো। পাওয়া গেলে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

	আবেগ শব্দ
'চিঠি বিলি' থেকে পাওয়া	
'সুখী মানুষ' থেকে পাওয়া	

অনুচ্ছেদ লিখে আবেগ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে আবেগ শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

২য় পরিচ্ছেদ

অর্থ ও অর্থান্তর

একটি শব্দের অনেক রকম অর্থ থাকতে পারে। বাক্যে প্রয়োগের ওপর শব্দের অর্থ নির্ভর করে। নিচের ছড়াটি পড়ো। এটি সুকুমার রায়ের লেখা। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছড়ার বইয়ের নাম 'আবোল তাবোল'। নিচের ছড়াটি সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' নামের ছড়ার বই থেকে নেওয়া হয়েছে। ছড়াটি পড়ার সময়ে 'পাকা' শব্দটি কত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে খেয়াল করো।

পাকাপাকি

সুকুমার রায়

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রং, পাকা কই তাহারে;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টনটন—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠনঠন।
রাঁধুনি বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে ॥

শব্দের অর্থ

আহার: ভোজন।

কিলানো: খিল বা গোঁজা ঢুকানো।

কুল: ফলের নাম।

গোঁফ: নাকের নিচে গজানো লোম।

জ্যাঠামি: অল্প বয়সে বেশি বয়সের মতো আচরণ।

দড়ি: রশি।

ফলার: ভাত ছাড়া নিরামিষ খাবার।

ফাগুন: ফাল্গুন।

ফোড়া: চামড়ার নিচে ফুলে ওঠা ঘা।

রাঁধুনি: যে রান্না করে।

লুচি: ভিতরে ফাঁপা ছোটো পরোটা।

সজোরে: খুব জোরে।

উপরের কবিতায় 'পাকা' শব্দ কত ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকা করো।

বাক্যে প্রয়োগ	'পাকা' শব্দের অর্থ
আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে	
কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে	
রোদে জলে টিকে রং, পাকা কই তাহারে	
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে	
হাত পাকে লিখে লিখে	
চুল পাকে বয়সে	
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে	
কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে	
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে	
কান পাকে ফোড়া পাকে	
কথা যার পাকা নয় কাজে তার ঠনঠন	
রাঁধুনি বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে	
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে	
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে	
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে	

মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ

একটি শব্দ শোনার সাথে সাথে মনে যে ছবি বা ধারণা জেগে ওঠে, সেটাকে ওই শব্দের মুখ্য অর্থ বলে। যেমন, 'মাথা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপরের যে অংশের ছবি মনে ভেসে ওঠে, সেটাই মাথা শব্দের মুখ্য অর্থ।

কোনো শব্দের মুখ্য অর্থের পাশাপাশি এক বা একাধিক গৌণ অর্থ থাকতে পারে। যেমন, 'মেয়েটির মাথা ভালো' বললে মেধা বা বুদ্ধিকে বোঝায়। আবার যদি বলা হয় 'রাস্তার মাথায় যাও', তবে মাথা বলতে রাস্তার শেষ প্রান্তকে বোঝায়।

নিচে কয়েকটি শব্দের মুখ্য অর্থ ও একাধিক গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখানো হলো।

কথা	মুখ্য অর্থ	মুখের ভাষা	(তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগে।)
	গৌণ অর্থ ১	প্রস্তাব	(তোমার কথা আমি মানতে রাজি।)
	গৌণ অর্থ ২	তিরস্কার	(ওর জন্য আমাকে কথা শুনতে হলো।)
কাজ	মুখ্য অর্থ	কর্ম	(ভালো কাজের জন্য ভালো পুরস্কার আছে।)
	গৌণ অর্থ ১	কর্তব্য	(তোমার কাজ পড়াশোনা করা।)
	গৌণ অর্থ ২	সমাধান	(ওর কাছে গেলে কাজ হবে।)
পাগল	মুখ্য অর্থ	মানসিক রোগী	(পাগল হয়ে সে এখন পথে পথে ঘুরছে।)
	গৌণ অর্থ ১	মুগ্ধ	(ভাটিয়ালি গানের পাগল করা সুরে মন ভরে যায়।)
	গৌণ অর্থ ২	অনুরাগী	(তিনি কাজ পাগল মানুষ।)
বড়ো	মুখ্য অর্থ	বৃহৎ	(বড়ো আমগাছটার নিচে তাকে দেখতে পাবে।)
	গৌণ অর্থ ১	বেশি বয়সের	(ওর কথা বলছ? ও আমার বড়ো ভাই।)
	গৌণ অর্থ ২	উদার	(তিনি অনেক বড়ো মনের মানুষ।)
মুখ	মুখ্য অর্থ	মুখের গর্ত	(দাদা মুখে পান পুরে কথা বলা শুরু করলেন।)
	গৌণ অর্থ ১	মুখমণ্ডল	(সে মুখে পাউডার দিচ্ছে।)
	গৌণ অর্থ ২	প্রবেশ পথ	(গলির মুখে রিকশাটা দাঁড়াল।)
শেষ	মুখ্য অর্থ	সমাপ্ত	(কাজটি গতকাল শেষ করেছি।)
	গৌণ অর্থ ১	ধ্বংস	(আগুনে পুড়ে বাড়িটি শেষ হয়ে গেল।)
	গৌণ অর্থ ২	প্রান্ত	(পথের শেষে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি।)

অর্থ বুঝে বাক্য লিখি

নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে মুখ্য অর্থ এবং এক বা একাধিক গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখাও।

১. মাথা
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

২. হাত
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

৩. কাঁচা
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

৪. কাটা
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

৫. চোখ
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

৬. কান
- মুখ্য অর্থ ______
- গৌণ অর্থ ১ ______
- গৌণ অর্থ ২ ______

অন্যের বাক্যের সঙ্গে তোমার বাক্যগুলো মিলিয়ে দেখো।

প্রতিশব্দ

রাত	কবুতর	আকাশ	চোখ	সংবাদ
বাড়ি	বাসনা	হাওয়া	ললাট	ভাগ্য
কপোত	খুশি	গগন	হর্ষ	ভবন
আনন্দ	ইচ্ছা	কপাল	ঘর	বাতাস
পায়রা	রজনি	নয়ন	রাত্রি	আকাঙ্ক্ষা
নেত্র	বায়ু	বার্তা	খবর	আসমান

উপরের ছক থেকে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দগুলো আলাদা করো। একটি করে দেখানো হলো।

	রাত	রাত্রি	রজনি
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

প্রতিশব্দ শিখি

একটা শব্দকে অন্য শব্দ দিয়েও প্রকাশ করা যায়। যেমন, 'আকাশ' না বলে 'আসমান' বা 'গগন' বলা যায়। যেসব শব্দের অর্থ অনুরূপ বা প্রায় সমান, সেসব শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। নিচে কিছু শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো।

অনেক: বেশি, বহু, প্রচুর, অধিক, অত্যন্ত।

আগুন: অগ্নি, অনল, বহ্নি।

কন্যা: মেয়ে, দুহিতা, ঝি।

তৈরি: গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত।

দেহ: শরীর, গা, গাত্র, তনু, অঙ্গ।

নারী: মানবী, মহিলা, স্ত্রীলোক।

পর্বত: পাহাড়, অদ্রি, গিরি।

পানি: জল, সলিল, নীর, বারি।

পুত্র: ছেলে, দুলাল, কুমার।

পৃথিবী: জগৎ, ভুবন, দুনিয়া, বিশ্ব, ধরণি।

বন: অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বনানী।

সমুদ্র: সাগর, সিন্ধু, পাথার।

সাপ: সর্প, অহি, ফণী, নাগ, ভুজঙ্গ।

সূর্য: রবি, তপন, অরুণ।

হাত: হস্ত, কর, বাহু, ভুজ।

প্রতিশব্দ বসিয়ে আবার লিখি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো। এরপর এখানকার অন্তত দশটি শব্দের বদল ঘটিয়ে অনুচ্ছেদটি নতুন করে লেখো।

আমার ছোটো মামা শহরে থাকেন। একদিন খবর পেলেন, রূপখালী গ্রামে লোকেরা একটা নতুন স্কুল খুলবে। তাঁর ইচ্ছা হলো, তিনিও এই কাজের সাথে যোগ দেবেন। তাই এক অন্ধকার রাতে তিনি ব্যাগপত্র গুছিয়ে রওনা দিলেন। অনেক দূরের পথ। বাসে করেই তাঁকে রওনা দিতে হলো। বাস থেকে যখন নামলেন, তখন সকাল হয়ে গেছে। পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে লাল রঙের। ছোটো মামার মনে হলো, এবার তিনি সত্যিই একটা ভালো কাজ করতে পারবেন।

বিপরীত শব্দ

দাগ দেওয়া শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

এই শহরে **অনেক** মানুষ থাকে।	বাক্য: এই শহরে **অল্প** মানুষ থাকে
বীথির বাড়ি **দুরে।**	বাক্য: ______________________
শুকনো খাবার আমার **পছন্দ।**	বাক্য: ______________________
আজ **গরম** পড়েছে।	বাক্য: ______________________
তিনি **ঘুমিয়ে** ছিলেন।	বাক্য: ______________________
এ জমি **উর্বর**।	বাক্য: ______________________
ভালো কাজ করব।	বাক্য: ______________________
তুমি **যাও**।	বাক্য: ______________________
ছেলেটি **চালাক**।	বাক্য: ______________________
কুকুর **বিশ্বাসী** প্রাণী।	বাক্য: ______________________

লক্ষ করো, বিপরীত শব্দ বসানোর ফলে বাক্যগুলোর অর্থ বদলে গেছে।

বিপরীত শব্দ বুঝি

যেসব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। যেমন, ধনী-গরিব, সৎ-অসৎ, বড়ো-ছোটো ইত্যাদি। নিচে কিছু শব্দ এবং তার বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
অধম	উত্তম
অল্প	বেশি
আপন	পর
আয়	ব্যয়
উঁচু	নিচু
উপস্থিত	অনুপস্থিত
খাঁটি	ভেজাল
খুচরা	পাইকারি
জয়	পরাজয়
জ্ঞানী	মূর্খ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
ভিতর	বাহির
ভীরু	সাহসী
মুখ্য	গৌণ
লাভ	ক্ষতি
সরব	নীরব
সুন্দর	কুৎসিত
স্থির	চঞ্চল
হার	জিত
হালকা	ভারী
হ্রাস	বৃদ্ধি

বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে বিপরীত শব্দ বসাই

এবার দাগ দেওয়া শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো এমনভাবে লেখো যাতে বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। এজন্য বাক্যের শেষে না, নি, নেই, নয় ইত্যাদি বসানোর দরকার হবে। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

এই শহরে <u>অনেক</u> মানুষ থাকে।	বাক্য: এই শহরে অল্প মানুষ থাকে না।
বীথির বাড়ি <u>দূরে</u>।	বাক্য: ____________
শুকনো খাবার আমার <u>পছন্দ</u>।	বাক্য: ____________
আজ <u>গরম</u> পড়েছে।	বাক্য: ____________
তিনি <u>ঘুমিয়ে</u> ছিলেন।	বাক্য: ____________
এ জমি <u>উর্বর</u>।	বাক্য: ____________
<u>ভালো</u> কাজ করব।	বাক্য: ____________
তুমি <u>যাও</u>।	বাক্য: ____________
ছেলেটি <u>চালাক</u>।	বাক্য: ____________
কুকুর <u>বিশ্বাসী</u> প্রাণী।	বাক্য: ____________

৩য় পরিচ্ছেদ

যতিচিহ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো। পড়তে গিয়ে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে খেয়াল করো। এ নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

জানি কথাটি শুনলে তোমাদের কারো বিশ্বাস হবে না সেই লেখক একদিন বিকালে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির তাঁর হাতে অনেকগুলো নতুন বই আমি অবাক হয়ে বললাম আপনি কি আমাদের বাড়িতে এসেছেন তিনি আমার কথার জবাবে ছোটো করে বললেন হ্যাঁ আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না শুধু তাঁর হাতের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম একসময়ে বললাম কিন্তু কেন তা কি জানতে পারি তিনি বললেন বারে তুমি বই পড়তে ভালোবাসো তাই বই নিয়ে এসেছি

বুঝতে চেষ্টা করি

সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো।

কথা বলার সময়ে কি আমরা একটানা কথা বলি? ______________________

একনাগাড়ে না বলে থেমে থেমে কথা বলি কেন? ______________________

সব কথা কি আমরা একই সুরে বলি? ______________________

লেখার সময়ে দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদির প্রয়োজন হয় কেন? ______________________

দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদি চিহ্ন কী নামে পরিচিত? ______________________

দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নচিহ্নের মতো আর কী কী চিহ্ন তুমি চেনো? ______________________

যতিচিহ্ন

মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে কম-বেশি থামা বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করতেও কিছু যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যতিচিহ্নের উদাহরণ: দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!) ইত্যাদি।

কোন যতিচিহ্নের কী কাজ

(১) দাঁড়ি (।)

দাঁড়ি বাক্যের সমাপ্তি বোঝায়।

যেমন: সে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরল।

(২) কমা (,)

একটু বিরতি বোঝাতে কমা ব্যবহার করা হয়।

যেমন: আমার পছন্দের ফুল গোলাপ, বেলি, জুঁই আর হাসনাহেনা।

(৩) সেমিকোলন (;)

ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক আছে এমন দুটি বাক্যের মাঝখানে সেমিকোলনের ব্যবহার হয়।

যেমন: তিনি এলেন; তবে বেশিক্ষণ বসলেন না।

(৪) প্রশ্নচিহ্ন (?)

সাধারণত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন বসে।

যেমন: সে কখন এসেছে?

(৫) বিস্ময়চিহ্ন (!)

বিভিন্ন আবেগ বোঝাতে বিস্ময়চিহ্ন বসে।

যেমন: বাহ্! তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকো।

(৬) হাইফেন (-)

দুটি শব্দকে এক করতে অনেক সময় হাইফেন ব্যবহার করা হয়।

যেমন: ভালো-মন্দ নিয়েই মানুষের জীবন।

(৭) ড্যাশ (–)

এক বাক্যের ব্যাখ্যা পরের বাক্যে করা হলে দুই বাক্যের মাঝে ড্যাশ বসে।

যেমন: তিনিই ভালো রাজা— যিনি প্রজাদের কথা সবসময়ে ভাবেন।

(৮) কোলন (:)

উদাহরণ উপস্থাপনের সময়ে কোলন বসে।

যেমন: যোগাযোগের দুটি রূপ: ভাষিক যোগাযোগ ও অভাষিক যোগাযোগ।

(৯) উদ্ধারচিহ্ন (‘ ’)

কারো কথা সরাসরি দেখাতে উদ্ধারচিহ্ন বসে।

যেমন: শিক্ষক বললেন, ‘তোমরা বড়ো হয়ে সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।’

কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে

উদাহরণ দেওয়ার সময়ে	
এক বাক্যের ব্যাখ্যা পরের বাক্যে করা হলে দুই বাক্যের মাঝে	
কারো কথা সরাসরি বোঝাতে	
কোনো বাক্যে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়	
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক আছে এমন দুটি বাক্যের মাঝখানে	
দুটি শব্দকে এক করতে	
বাক্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগ বোঝাতে	
বাক্যের বিবরণ সাধারণভাবে শেষ হলে	
বাক্যের মধ্যে যখন একটু থামতে হয়	

যতিচিহ্ন বসাই

পরিচ্ছেদের শুরুতে দেওয়া অনুচ্ছেদটিতে এখন যতিচিহ্ন বসাও:

জানি কথাটি শুনলে তোমাদের কারো বিশ্বাস হবে না সেই লেখক একদিন বিকালে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির তাঁর হাতে অনেকগুলো নতুন বই আমি অবাক হয়ে বললাম আপনি কি আমাদের বাড়িতে এসেছেন তিনি আমার কথার জবাবে ছোটো করে বললেন হ্যাঁ আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না শুধু তাঁর হাতের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম একসময়ে বললাম কিন্তু কেন তা কি জানতে পারি তিনি বললেন বারে তুমি বই পড়তে ভালোবাসো তাই বই নিয়ে এসেছি

যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখি

একটি অনুচ্ছেদ লেখো যেখানে বিভিন্ন রকম যতিচিহ্নের ব্যবহার আছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বাক্য

নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং বাক্যগুলোতে সাধারণভাবে কী অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে তার উল্লেখ করো।

১. আমি বাজারে যাচ্ছি। ______________________

২. তুমি কোথায় যাচ্ছ? ______________________

৩. তুমি বাজারে যাও। ______________________

৪. ওরে বাবা! কত বড়ো বাজার! ______________________

বিভিন্ন ধরনের বাক্য

যে কোনো বাক্যই কোনো না কোনো অর্থ প্রকাশ করে। বেশিরভাগ বাক্যে সাধারণভাবে কোনো বিবরণ দেওয়া হয়। এছাড়া কোনো কোনো বাক্য দিয়ে আমরা প্রশ্ন বোঝাই, কোনো কোনো বাক্য দিয়ে আদেশ-অনুরোধ বোঝাই এবং কোনো কোনো বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের বিস্ময় প্রকাশ পায়।

বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **বিবৃতিবাচক বাক্য:** সাধারণভাবে কোনো বিবরণ প্রকাশ পায় যেসব বাক্যে, সেগুলোকে বিবৃতিবাচক বাক্য বলে। যেমন: আগামীকাল স্কুলে একজন বিশেষ অতিথি আসবেন।

২. **প্রশ্নবাচক বাক্য:** কারো কাছ থেকে কিছু জানার জন্য যেসব বাক্য বলা হয় বা লেখা হয়, সেগুলোকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলে। যেমন: তুমি কি জানো কাল কে আসবেন স্কুলে?

৩. **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য:** আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য হয়। যেমন: তোমরা সবাই কাল স্কুলে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কোরো।

৪. **আবেগবাচক বাক্য:** কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক হয়ে যে ধরনের বাক্য তৈরি হয়, সেগুলোকে আবেগবাচক বাক্য বলে। যেমন: দারুণ! তুমি সময়মতো আসতে পেরেছ।

বিভিন্ন ধরনের বাক্য খুঁজি

'সুখী মানুষ' নাটকটি থেকে চার ধরনের বাক্য খুঁজে বের করো।

১. বিবৃতিবাচক বাক্য:

২. প্রশ্নবাচক বাক্য:

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য:

৪. আবেগবাচক বাক্য:

অনুচ্ছেদ লিখি

বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক—এই চার ধরনের বাক্য ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই

বইপত্রের বাইরেও আমাদের চারপাশে অনেক রকম লেখা দেখা যায়। দোকানের সামনে, রাস্তার পাশের দেয়ালে, মিছিল বা শোভাযাত্রায়, আমন্ত্রণপত্রে, পত্রিকার পাতায়, এমনকি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রে এসব লেখা তোমরা দেখে থাকবে। এমন কিছু নমুনা নিচে দেওয়া আছে। প্রতিটি নমুনা ভালো করে দেখো, তারপর ছবির নিচে দেওয়া ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করো।

উপরের লেখাটি কী নামে পরিচিত? ______________________________

____

____

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম? ______________________________

____

____

এর ব্যবহার কী? ______________________________

____

____

উপরের লেখাটি কী নামে পরিচিত? ____________________

____

____

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম? ____________________

____

____

এর ব্যবহার কী? ____________________

____

____

উপরের লেখাটি কী নামে পরিচিত? ______________________

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম? ______________________

এর ব্যবহার কী? ______________________

সুধী

আগামী ৪ঠা জুলাই ২০২৩, শুক্রবার 'জীবনগড়ি' গ্রন্থাগারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বইমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট লেখক ইউসুফ হাসান।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

সোমা সুলতানা
আহ্বায়ক, তিন বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি

অনুষ্ঠানসূচি:

বিকাল ৪:০০ মিনিট	বিকাল ৪:৩০ মিনিট
বইমেলার উদ্বোধন	আলোচনা সভা

স্থান: জীবনগড়ি পাঠাগারের সামনের চত্বর, সুবর্ণপুর।

উপরের লেখাটি কী নামে পরিচিত? ______________________

____

____

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম? ______________________

____

____

এর ব্যবহার কী? ______________________

____

____

খবরের কাগজের মধ্যে টুথপেস্টের ছবিযুক্ত লেখাটি কী নামে পরিচিত?

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম?

এর ব্যবহার কী?

উপরের টেলিভিশনের নিচের দিকের লেখাটি কী নামে পরিচিত? ____________________

____

____

লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম? ____________________

____

____

এর ব্যবহার কী? ____________________

____

____

চারপাশের নানা রকম লেখা

সাইনবোর্ড: কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন বা দোকানপাটের নাম-পরিচয় তুলে ধরা হয় যেখানে, তাকে সাইনবোর্ড বলে। সাইনবোর্ডে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া থাকে।

পোস্টার: বড়ো আকারের কাগজে কোনো কথা বা ছবি লেখা হলে বা ছাপানো হলে তাকে পোস্টার বলে। সবার নজরে পড়ার জন্য পোস্টারের লেখা ও ছবির আকার বড়ো হয়। নির্বাচনের সময়ে এটা বেশি দেখা যায়।

ব্যানার: সবাইকে জানানোর উদ্দেশ্যে লম্বা কাপড়ে লেখা কোনো বক্তব্য বা তথ্যকে ব্যানার বলে। ব্যানার সাধারণত শোভাযাত্রার সামনে থাকে। কখনো কখনো টাঙিয়েও রাখা হয়।

আমন্ত্রণপত্র: কোনো অনুষ্ঠানে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে লেখা চিঠিকে আমন্ত্রণপত্র বলে। আমন্ত্রণপত্রে অনুষ্ঠানের বিবরণ, স্থান, তারিখ, সময়সূচি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

বিজ্ঞাপন: পণ্য বা তথ্য সম্পর্কে সবাইকে জানাতে পত্রিকায় বা অন্য কোনো মাধ্যমে যে প্রচার চালানো হয়, তাকে বিজ্ঞাপন বলে। বিজ্ঞাপন লিখে বা ছেপে প্রকাশ করা যায়, আবার অডিও-ভিডিও মাধ্যমেও শোনা বা দেখার সুযোগ থাকে।

স্ক্রল: সাধারণত টেলিভিশনে অনুষ্ঠান বা সংবাদ প্রচারের সময়ে স্ক্রিনের নিচের দিকে সরু লাইনে কিছু কথা ডান থেকে বাম দিকে সরতে দেখা যায়, এগুলোকে স্ক্রল বলে। স্ক্রলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ও জরুরি তথ্য জানা যায়।

নিজেরা করি

মনে করো, ‘সততা স্টোর’ নামে তোমরা একটি দোকান খুলতে যাচ্ছ। এই দোকান থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারবে। বিষয়টি মাথায় রেখে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিচের কাজগুলো করো।

১. দোকানের সামনে টানানোর জন্য একটা সাইনবোর্ড তৈরি করো।
২. দোকানের প্রচারের জন্য একাধিক পোস্টার বানাও।
৩. তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে শোভাযাত্রায় ব্যবহার করার জন্য একটি ব্যানার তৈরি করো।
৪. দোকানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র লেখো।
৫. দোকানের উদ্দেশ্য ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তথ্য জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করো।
৬. দোকান উদ্বোধনের খবর টেলিভিশনে প্রচারের জন্য একটি স্ক্রল-বাক্য রচনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

বুঝে পড়ি লিখতে শিখি

•১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

নিচের লেখাটি জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। জাহানারা ইমামের পুত্র রুমী গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শহিদ হয়েছিলেন। এজন্য জাহানারা ইমাম ‘শহিদ জননী’ নামে পরিচিত।

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

১৯ মার্চ ১৯৭১, শুক্রবার

আজ রুমী অভিনব স্টিকার নিয়ে এসেছে— ‘এককেটি বাংলা অক্ষর এককেটি বাঙালির জীবন’। বাংলায় লেখা স্টিকার এই প্রথম দেখলাম। রুমী খুব যত্ন করে স্টিকারটা গাড়ির পেছনের কাচে লাগাল। স্টিকারের পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। উনি অবশ্য নিজেকে শিল্পী না বলে ‘পটুয়া’ বলেন। কয়েকদিন আগে ‘বাংলার পটুয়া সমাজ’ বলে একটা সমিতি গঠন করেছেন। গত শুক্রবার এই সমিতির একটা সভাও হয়ে গেল।

‘বাংলার পটুয়া সমাজ’-এর এই সভাতে শাপলা ফুলকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

২২ মার্চ ১৯৭১, সোমবার

ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গতকাল একমুহূর্ত বিশ্রাম পায়নি বাড়ির কেউ। সারাদিনে এত মেহমান এসেছিল যে চা-নাশতা দিতে দিতে সুবহান, বারেক, কাশেম সবাই হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু দেশব্যাপী দ্রুত প্রবহমান ঘটনাবলির উত্তেজনায় অন্য সবার সঙ্গে আমিও এত টগবগ করেছি যে টের পাইনি কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে।

রুমী, জামী আজ সাড়ে আটটাতেই নাশতা খাওয়া শেষ করে কোথায় যেন গেছে।

আগামীকাল ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এর জন্য সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনা। জনমনে বিপুল সাড়া ও উদ্দীপনা।

২৩ মার্চ ১৯৭১, মঙ্গলবার

আজ প্রতিরোধ দিবস।

খুব সকালে বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক— সবকিছু মিশে একাকার অনুভূতি।

নাশতা খাওয়ার পর সবাই মিলে গাড়িতে করে বেরোলাম— খুব ঘুরে বেড়ালাম সারা শহরে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে। সবখানে সব বাড়িতে কালো পতাকার পাশাপাশি সবুজ-লালে-হলুদে উজ্জ্বল নতুন পতাকা পতপত করে উড়ছে। ফটো তুললাম অনেক।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে শহিদ মিনারের সামনে গিয়ে। কামরুল হাসানের আঁকা কয়েকটা দুর্দান্ত পোস্টার দেখলাম। মিনারের সিঁড়ির ধাপের নিচে সার সার সেঁটে রেখেছে। (বইয়ের কিছু অংশ)

শব্দের অর্থ

অভিনব:	নতুন।	**ডিজাইন:**	নকশা।
আলোড়ন:	যা নাড়া দেয়।	**পরিকল্পনা:**	কী করতে হবে তা ঠিক করা।
উদ্দীপনা:	যা উদ্দীপ্ত করে।	**পোস্টার:**	লিখে বা ছবি এঁকে কিছু বোঝানো হয় এমন বড়ো কাগজ।
একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন:	বাংলা ভাষার একেকটি অক্ষরের পেছনে লুকিয়ে আছে ভাষা-আন্দোলনে আত্মদানের স্মৃতি।	**প্রতিরোধ দিবস:**	১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পালিত প্রতিবাদ দিবস।
ঘটনাবলি:	বহু ঘটনা।	**প্রতীক:**	চিহ্ন।
টগবগ করা:	অস্থির হওয়া।	**প্রবহমান:**	যা বয়ে চলেছে।

প্রস্তাব: যা করতে চাওয়া হয়।

শিরশির: উত্তেজনার অনুভূতি।

সবুজ-লালে-হলুদে উজ্জ্বল পতাকা: বাংলাদেশের পতাকার প্রথম নকশা ছিল সবুজের ভেতর লাল বৃত্ত, আর বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র।

সভা: মিটিং।

সমিতি: কয়েকজন মিলে তৈরি করা সংগঠন।

সাড়া: একমত হওয়ার মনোভাব।

সার সার সেঁটে রাখা: সারি করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখা।

স্টিকার: কোথাও লাগানো যায় এমন কাগজের টুকরা।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে? ____________________

____

____

খ. লেখাটি কোন সময়ের ও কয়দিনের ঘটনা? ____________________

____

____

গ. লেখক কী কী কাজের উল্লেখ করেছেন? ____________________

____

____

ঘ. লেখার তিন অংশের শুরুতে তারিখ দেওয়া কেন? ____________________

____

____

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে? ____________________

____

বলি ও লিখি

‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

রোজনামচা লিখতে শিখি

প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা নিজের মতো করে লিখে রাখা যায়। এভাবে লিখে রাখা বিবরণকে রোজনামচা বলে। তুমিও নিয়মিত রোজনামচা লিখতে পারো। রোজনামচা লেখার সময়ে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রেখো:

১. শুরুতে তারিখ এবং জায়গার নাম লিখে রাখতে হয়।
২. বর্ণনা পূর্ণবাক্যে লিখতে হয়।
৩. বাক্যে এমন ক্রিয়া শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যা দিয়ে বোঝা যায়, কাজটি হয়ে গেছে। যেমন: সকালে সাঁতার কাটলাম। অথবা, সকালে সাঁতার কেটেছি।
৪. ব্যক্তিগত বিবরণের পাশাপাশি ওই দিনে ঘটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথাও লেখা যায়।

মনে রেখো, অনুমতি ছাড়া অন্যের রোজনামচা পাঠ করা ঠিক নয়।

রোজনামচা লিখি

এখন তুমি তিন-চার দিনের ঘটনা রোজনামচার আকারে লিখে শিক্ষককে দেখাও।

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক লেখা

জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, অনেক অভিজ্ঞতা থাকে, যা লিখে রাখা যায়। লিখে রাখলে কখনো তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'আমার দেখা নয়াচীন' বই থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে বঙ্গবন্ধু চীন সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটি লেখেন। এটি ২০২০ সালে ছাপা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির পিতা।

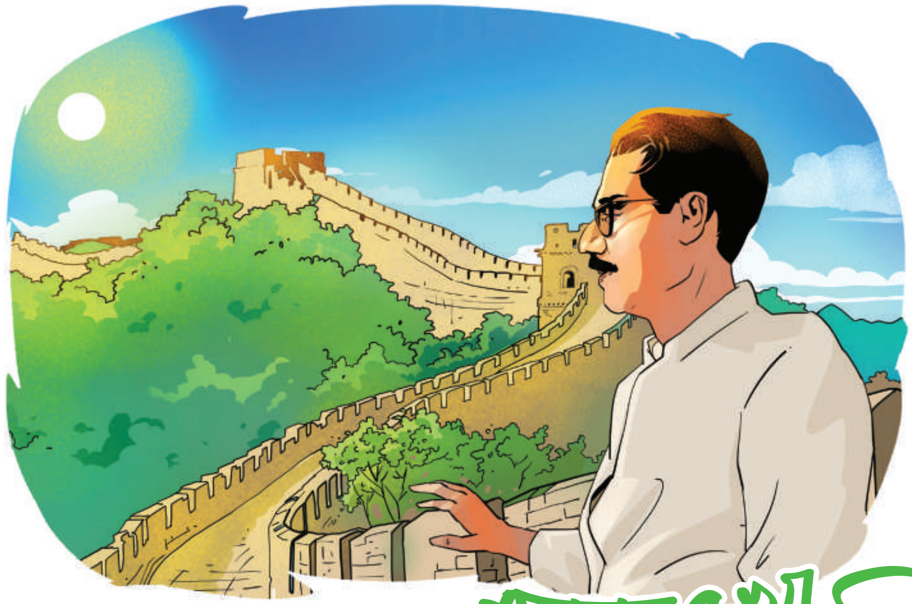

আমার দেখা নয়াচীন

শেখ মুজিবুর রহমান

আমরা মিউজিয়ামে পৌঁছালাম। অনেক নিদর্শন বস্তু দেখলাম। উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু দেখেছিলাম বলে মনে হয় না। তবে অনেক পুরানো কালের স্মৃতি দেখা গেল।

পরে আমরা লাইব্রেরি দেখতে যাই। শুনলাম সাংহাই শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাবলিক লাইব্রেরি। খুবই বড়ো লাইব্রেরি সন্দেহ নেই, ব্যবস্থাও খুব ভালো। রিডিং রুমগুলো ভাগ ভাগ করা রয়েছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যও একটা রুম আছে। সেখানে দেখলাম ছোটোদের পড়বার উপযুক্ত বইও আছে বহু, ইংরেজি বইও দেখলাম।

লাইব্রেরির সাথে ছোটো একটা মাঠ আছে, সেখানে বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে। মাঠে বসে পড়াশোনা করার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। আমার মনে হলো কলকাতার ইমপেরিয়াল লাইব্রেরির মতোই হবে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, লাইব্রেরিটা বহু পুরানো।

সেখান থেকে আমরা অ্যাকজিবিশন দেখতে যাই। আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নতুন চীন সরকার কী কী জিনিসপত্র তৈরি করেছেন তা দেখানো হলো। কত প্রকার ইনস্ট্রুমেন্ট করেছে, তাও দেখাল। আমরা ফিরে এলাম হোটেলে।

এক ঘণ্টা পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সাংহাই শহরের পাশে যে নদী বয়ে গেছে, তা দেখবার জন্য। আমাদের দেশের মতোই নৌকা, লঞ্চ চলছে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে।

পরে ছেলেদের খেলার মাঠে যাই, দেখি হাজার তিনেক ছেলেমেয়ে খেলা করছে। শিক্ষকরাও তাদের সাথে আছেন। আমাদের যাওয়ার সাথে সাথে কী একটা শব্দ করল, আর সকল ছেলেমেয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল এবং আর একটা শব্দ হওয়ার পরে আমাদের সালাম দিলো, আমরা সালাম গ্রহণ করলাম। তারা স্লোগান আরম্ভ করল। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

দোভাষীকে বললাম, 'চলুন যেখানে সবচেয়ে বড়ো বাজার, সেখানে নিয়ে চলুন।' সেখানে পৌঁছেই একটা সাইকেলের দোকানে ঢুকলাম। সেখানে চীনের তৈরি সাইকেল ছাড়াও চেকশ্লোভাকিয়ার তৈরি তিন চারটা সাইকেল দেখলাম। তাতে দাম লেখা ছিল। চীনের তৈরি সাইকেল থেকে তার দাম কিছু কম। আমি বললাম, 'বিদেশি মাল তা হলে কিছু আছে?' দোকানদার উত্তর দিলো, 'আমাদের মালও তারা নেয়।' আমি বললাম, 'আপনাদের তৈরি সাইকেল থেকে চেকশ্লোভাকিয়ার সাইকেল সস্তা। জনসাধারণ সস্তা জিনিস রেখে দামি জিনিস কিনবে কেন?'

দোকানি জানায়: 'আমাদের দেশের জনগণ বিদেশি মাল খুব কম কেনে। দেশি মাল থাকলে বিদেশি মাল কিনতে চায় না, যদি দাম একটু বেশিও দিতে হয়।' সাংহাইয়ের অনেক দোকানদার ইংরেজি বলতে পারে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে না, কারণ জনসাধারণ খুব সজাগ হয়ে উঠেছে। যদি কেউ একটু বেশি দাম নেয়, তবে তার আর উপায় নেই! ছেলে বাপকে ধরিয়ে দিয়েছে, স্ত্রী স্বামীকে ধরিয়ে দিয়েছে, এ রকম বহু ঘটনা নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে হয়েছে। তাই দোকানদারদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সরকার যদি কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের ধরতে পারে, তবে কঠোর হস্তে দমন করে। এ রকম অনেক গল্প আমাদের দোভাষী বলেছে। রাতে হোটেলে ফিরে এলাম। আগামীকাল সকালে আমরা রওনা করব। (বইয়ের কিছু অংশ)

শব্দের অর্থ

অ্যাকজিবিশন: প্রদর্শনী বা মেলা।

ইনস্ট্রুমেন্ট: যন্ত্রপাতি।

ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি: একটি লাইব্রেরির নাম।

উল্লেখযোগ্য: উল্লেখ করার মতো।

কঠোর হস্তে দমন করা: কঠিন শাস্তি দেওয়া ।

কালোবাজারি: অবৈধ কেনা-বেচা।

চেকশ্লোভাকিয়া: ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ।

দোভাষী: যিনি এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে শোনান।

নয়াচীন: নতুন চীন।

নিদর্শন বস্তু: যেসব বস্তু জাদুঘরে দেখানো হয়।

পাবলিক লাইব্রেরি: যে লাইব্রেরিতে গিয়ে সবাই বই পড়তে পারে।

বন্দোবস্ত: ব্যবস্থা।

বাদাম দিয়ে চলে: পাল তুলে চলে।

বিদেশি মাল: বিদেশি দ্রব্য।

ভীতির সঞ্চার হওয়া: ভয় তৈরি হওয়া।

মিউজিয়াম: জাদুঘর।

মুনাফাখোর:	যে অতিরিক্ত লাভ করতে চায়।
রিডিং রুম:	পড়ার ঘর।
সজাগ:	সতর্ক।
সরকার কায়েম হওয়া:	সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
সাংহাই:	চীনের একটি বন্দর নগরী।
স্লোগান:	উঁচু স্বরে উচ্চারিত সমবেত কণ্ঠের দাবি।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন? ______

খ. বিবরণটি কোন সময়ের ও কোন দেশের? ______

গ. এই বিবরণে বাংলাদেশের সাথে কী কী মিল-অমিল আছে? ______

ঘ. লেখাটিতে চীনের মানুষের দেশপ্রেমের কোন নমুনা পাওয়া যায়? ______

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে? ______

বলি ও লিখি

'আমার দেখা নয়াচীন' রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

কীভাবে লিখব বিবরণ

বিবরণ লেখার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। দেখার ভঙ্গি ও লেখার ধরন একেক জনের একেক রকম। এমনকি, একই বিষয় নিয়ে দুজন লেখকের লেখাও এক রকম হয় না। তবে, বিবরণ লেখার সাধারণ কিছু নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. প্রথমে লেখার বিষয় ঠিক করতে হয়।

২. বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে লেখা যায়, তা ভাবতে হয়।

৩. লেখার সময়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে তার জবাব খুঁজতে হয়। এক্ষেত্রে কী, কেন, কীভাবে, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন কাজে লাগতে পারে।

৪. লেখায় ধারাবাহিকতা থাকা দরকার।

৫. আবেগ-বর্জিত সহজ-সরল ভাষায় বিবরণ তৈরি করতে হয়।

৬. বিষয়ের সাথে মিল রেখে লেখাটির একটি শিরোনাম দিতে হয়।

বিবরণ লিখি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাও। চারপাশ ভালো করে দেখো। লেখার জন্য এর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় বাছাই করো। বিষয় হতে পারে গাছপালা, পশুপাখি, রাস্তা, নদী, মানুষ, প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য যে কোনো কিছু। এমনকি এ সময়ে দেখা কোনো ঘটনাও লেখার বিষয় হতে পারে। বাছাই করা বিষয়ের উপর ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লেখো।

০৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক লেখা

তথ্যকে সাজিয়ে তথ্যমূলক লেখা তৈরি করা হয়। নিচে একটি তথ্যমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে লেখা। এটি রচনা করেছেন সেলিনা হোসেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখক।

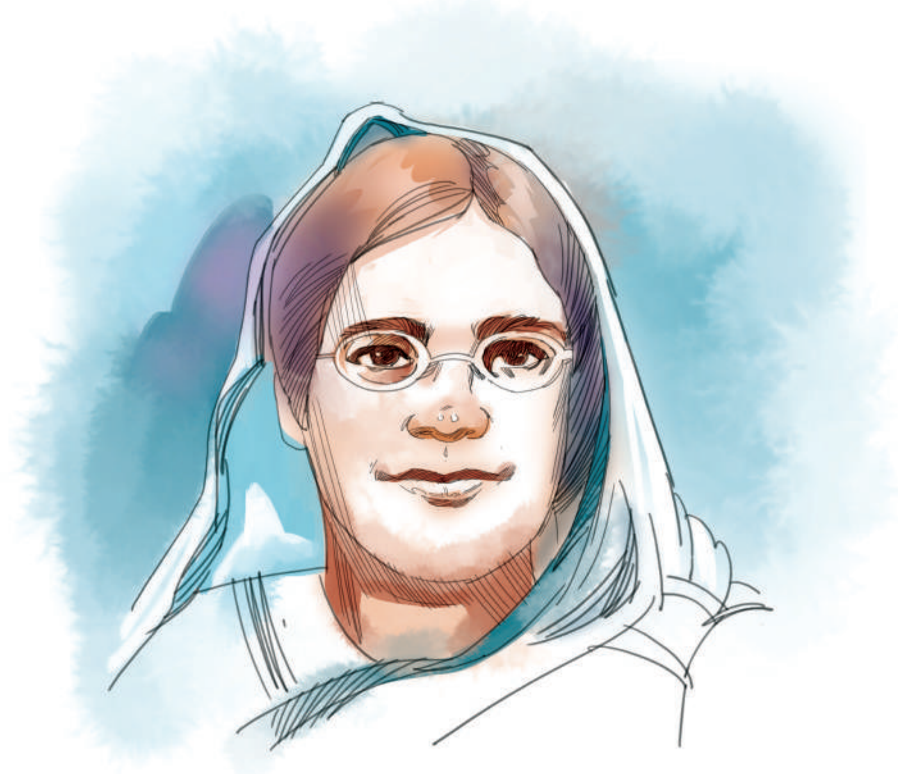

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

সেলিনা হোসেন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁদের বাড়িটি ছিল বিশাল। সাড়ে তিন বিঘা জমির মাঝখানে ছিল তাঁদের বাড়িটি।

রোকেয়া যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ফলে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। মেয়েদের অবস্থান ছিল খুবই শোচনীয়। পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু মেধাবী রোকেয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল লেখাপড়ার প্রতি।

রোকেয়ার বড়ো দুই ভাই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বোনদের আগ্রহ দেখে বড়ো ভাই ইব্রাহীম সাবের বোন করিমুন্নেসা ও রোকেয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। করিমুন্নেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রোকেয়া তাঁর রচিত 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড করিমুন্নেসাকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আপাজান! আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি । অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে।' নানা বাধা এড়িয়ে রোকেয়া আপন সাধনায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন অসাধারণ নারী।

১৮৯৭ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবপ্রভা' পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা 'পিপাসা'। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা 'সুলতানাজ ড্রিম' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচজন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী-কর্মী । তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে।

১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুস্থ নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি: 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড (১৯০৪) , 'সুলতানাজ ড্রিম' (১৯০৮), 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২২), 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাঙালি সমাজে তিনি শ্রদ্ধেয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক. মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই. নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।

শব্দের অর্থ

অক্লান্ত : ক্লান্তিহীন।

অগ্রগতি : এগিয়ে চলা।

অগ্রদূত : পথপ্রদর্শক।

অনুকূলে : পক্ষে।

অনুপ্রেরণা : উৎসাহ।

আগ্রহ : ইচ্ছা।

আত্মপ্রকাশ : আবির্ভাব।

আবেদন-নিবেদন : অনুরোধ।

উৎসর্গ-পত্র : বইটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে বইয়ের যে পাতায় তা লেখা থাকে।

উপমহাদেশ : দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অঞ্চল।

খন্ড : অংশ।

ঘোর : প্রবল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট : সরকারি কর্মকর্তা।

দিকনির্দেশনা : পথ দেখানো।

দুঃস্থ : অসহায়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন : ভবিষ্যতে কী হবে তা যিনি আন্দাজ করতে পারেন।

নারীমুক্তি : নারীর স্বাধীনতা।

নিরলস : যার আলস্য নেই।

পর্দাপ্রথা : নারীদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার সামাজিক রীতি।

পারদর্শী : দক্ষ।

প্রচলন : চালু।

প্রবল : খুব।

প্রভূত : প্রচুর।

বর্ণপরিচয় : বর্ণমালা শেখার বই।

বাঙ্গালা : বাংলা ভাষা।

বিংশ শতাব্দী : বিশ শতক (১৯০১ - ২০০০ সাল)।

বিশাল : অনেক বড়ো।

ভাগলপুর : বিহারের একটি জেলাশহর।

ভূসম্পত্তি : জমিজমা।

মাদ্রাজ : ভারতের একটি শহর। বর্তমান নাম চেন্নাই।

শোচনীয় : অত্যন্ত খারাপ।

সংগঠন : প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা : সমাজে সম্মানজনক অবস্থা নিয়ে থাকা।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ : একটি কলেজের নাম।

স্থানান্তর : জায়গা বদল।

স্নেহের প্রসাদে : আদরে।

স্বাবলম্বী : স্বনির্ভর।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই লেখায় কী ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?

খ. এই লেখার কোন তথ্যটি তোমার ভালো লেগেছে?

গ. এ ধরনের আর কী কী রচনা তুমি আগে পড়েছ?

ঘ. কাদের নিয়ে এ ধরনের লেখা তৈরি করা হয়?

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে?

বলি ও লিখি

'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

কীভাবে লিখব তথ্যমূলক লেখা

মূলত তথ্য উপস্থাপন করা হয় যেসব রচনায়, সেগুলো তথ্যমূলক লেখা। তথ্য নানা ধরনের হতে পারে। তাই তথ্যমূলক লেখাও নানা রকম হয়। জীবনীও এক ধরনের তথ্যমূলক লেখা। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকোষ গ্রন্থে কিংবা অনলাইনে উইকিপিডিয়ায় বহু ধরনের তথ্যমূলক লেখা পাওয়া যায়।

তথ্যমূলক লেখার সাধারণ কিছু নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. কী নিয়ে লেখা হবে, তা ঠিক করতে হয়।
২. লেখাটিতে কী ধরনের তথ্য থাকবে, তা নিয়ে ভাবতে হয়।
৩. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।
৪. ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তথ্যগুলো সাজাতে হয়।
৫. বিষয়ের সাথে মিল রেখে লেখাটির একটি শিরোনাম তৈরি করতে হয়।
৬. তথ্যকে স্পষ্ট করতে ছবি, ছক, সারণি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

তথ্যমূলক রচনার প্রস্তুতি

তোমরা দলে ভাগ হও। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব তথ্য সংগ্রহ করো।

১. প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
২. অবস্থান ও কাঠামো
৩. বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী
৪. বিভিন্ন কর্মকাণ্ড
৫. অর্জন ও কৃতিত্ব
৬. প্রতিষ্ঠানের ছবি

প্রতিটি দলের সংগ্রহ করা তথ্য আলাদা আলাদা কাগজে লিখে বড়ো কাগজে সেঁটে দাও। বড়ো কাগজটি এমন এক জায়গায় রাখো যাতে সবাই দেখতে পায়।

বড়ো কাগজে সেঁটে রাখা তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে একটি তথ্যমূলক রচনা তৈরি হতে পারে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক লেখা

তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ

সব ধরনের লেখায় তথ্য থাকে। উপাত্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের ছক, সারণি ও বিবরণের মধ্যে। এসব তথ্য ও উপাত্তকে বিশ্লেষণ করা হয় যেসব লেখায়, সেগুলোকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। বিশ্লেষণমূলক লেখা দুই ধরনের: (১) তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখা ও (২) উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক লেখা।

নিচে একটি তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি আবদুল্লাহ আল-মুতীর লেখা। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানের অনেক জটিল বিষয়কে তিনি সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বই: 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যের শেষ নেই' ইত্যাদি।

কীট পতঙ্গের সঙ্গে বসবাস

আবদুল্লাহ আল-মুতী

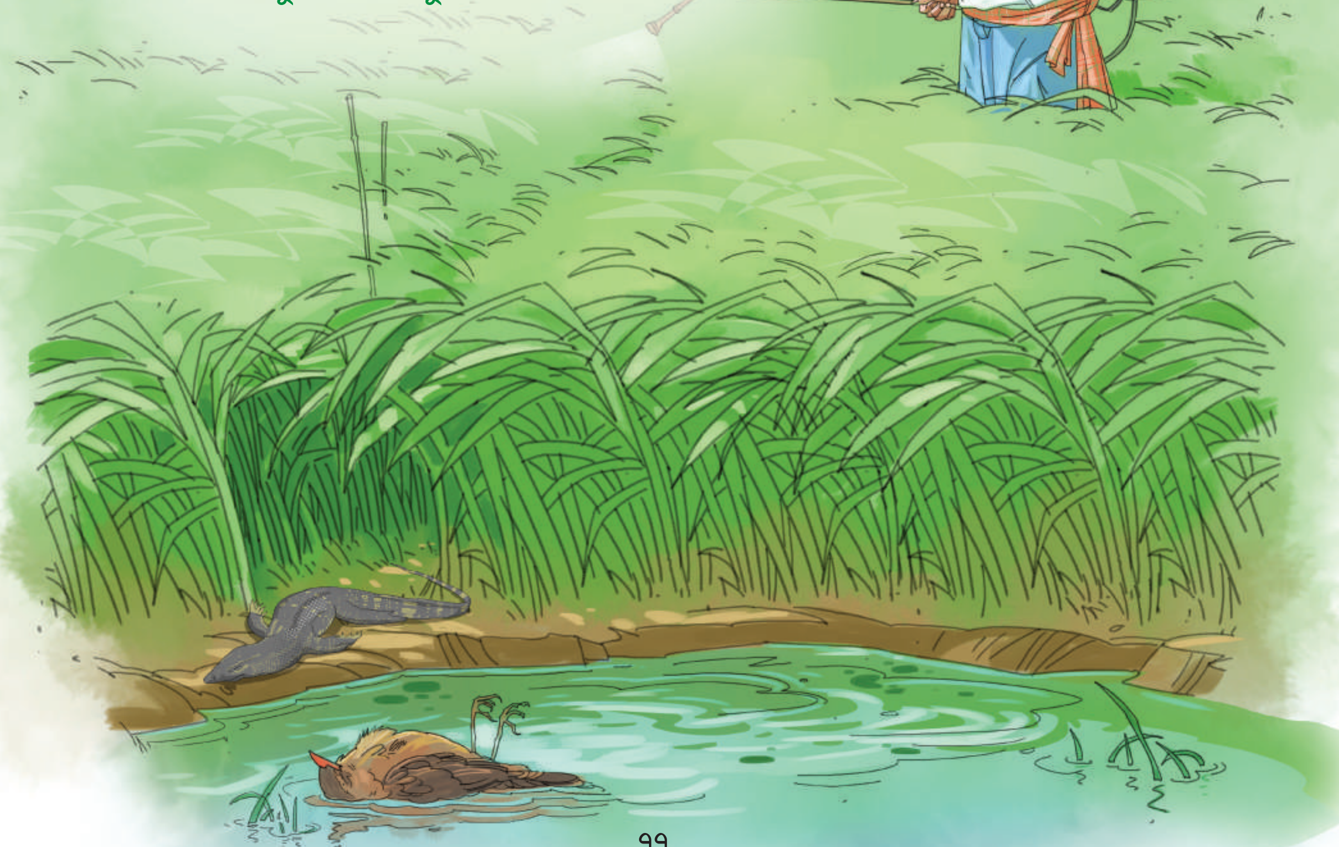

প্রজাপতি আর মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু খেতে গিয়ে ফুলে ফুলে পরাগযোগ ঘটায়; তাতেই খেতে ফসল ফলে, গাছে ফল ধরে। এসব উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হলে কমে যায় খেতের ফসল, বাগানের ফলন। তাছাড়া পোকামাকড় খেয়ে বাঁচে অনেক পাখি আর অন্যান্য প্রাণী। কাজেই ঢালাওভাবে পোকামাকড় মেরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়তে থাকে এসব প্রাণী।

ক্রমে ক্রমে আরো মারাত্মক একটা বিপদের কথা বিজ্ঞানীরা জানতে পেলেন। সে হলো অনেক জাতের কীটনাশকের গুণাগুণ সহজে নষ্ট হয় না। এগুলো পানির মধ্য দিয়ে, খাবারের মধ্য দিয়ে খুব অল্পমাত্রায় প্রাণীর দেহে বা মানুষের দেহে ঢুকে সেখানে চর্বিতে বা আর কোথাও জমে থাকতে পারে। এভাবে কীটনাশক জমে-ওঠার ফলে তার বিষক্রিয়ায় শুধু যে নানা রকম মারাত্মক রোগ হতে পারে তা নয়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ধরা যাক কয়েক লাখ গাছের ওপর ছড়ানো হলো মাত্র এক গ্রাম কীটনাশক। এতে পাতার ওপর কীটনাশকের পরিমাণ হলো হয়তো মাত্র এক কোটি ভাগের এক ভাগ। তারপর এক লাখ পোকায় খেল এসব গাছ। পোকাদের শরীরে কীটনাশকের পরিমাণ দাঁড়াল দশ লাখে এক ভাগ। এবার শ-খানেক পাখি খেল এসব পোকা। পাখিদের শরীরে কীটনাশক হলো প্রতি লাখে এক ভাগ। এবার একটি বাজ খেল এমনি ক-টি পাখি। তার শরীরে বিষ হলো হাজার ভাগের এক ভাগ। দেখা গেল এভাবে বিষের কবলে অনেক নদী-হ্রদের পানিতে মাছ মরে যাচ্ছে, বিষাক্ত মাছ খেয়ে নানা জাতের পাখিও মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সবটা মিলিয়ে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে আমাদের চারদিকে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। তাতে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হচ্ছে, অথচ যেসব ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক তৈরি হয়েছিল তারা দিব্যি বিষকে গা-সওয়া করে নিয়ে বংশ বাড়িয়ে চলেছে।

এসব জানাজানি হবার পর আজ বিজ্ঞানীরা আবার প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ দমন করার ওপর জোর দিচ্ছেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় থাকলে এমনিতে কীটপতঙ্গ অনেকটা দমন হয়। যেমন কাক, শালিক, চড়ুই, টুনটুনি—এসব পাখি খেতের পোকামাকড় ধরে খায়। কাজেই পাখি কমে গেলে পোকামাকড়ের সংখ্যা বাড়ে। আবার গোসাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি এসব প্রাণী এবং অনেক পোকামাকড় ও অন্য পোকামাকড়দের ধরে খায়। গোসাপ, ব্যাঙ মেরে শেষ করলে পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়ে ওঠে।

এখন রাসায়নিক কীটনাশক যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করে অন্যভাবে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন, পাটের শুঁয়োপোকা আর মাজরাপোকা মারার ভালো উপায় হলো তাদের ডিম বা অল্প বয়সের কিড়া কুড়িয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া। অনেক পূর্ণবয়স্ক পোকা রাতের বেলা আলোর দিকে ছুটে আসে। এসব পোকাকে সহজেই আলোর ফাঁদ পেতে মারা যায়।

শব্দের অর্থ

কিড়া : পোকা, কীট।

কীটপতঙ্গ : পোকামাকড়।

কীটনাশক : যে বিষ দিয়ে পোকামাকড় মারা হয়।

গা-সওয়া : সহনীয়।

গুণাগুণ : কার্যকারিতা।

গোসাপ : গুইসাপ।

ঢালাওভাবে : নির্বিচারে।

পরাগযোগ : পরাগরেণু যুক্ত হওয়া।

বিষক্রিয়া : বিষের কার্যকারিতা।

ভারসাম্য : সামঞ্জস্য।

মাজরাপোকা : ধানগাছের ক্ষতিকর পোকা।

শুঁয়োপোকা : সারা গায়ে লোমযুক্ত এক ধরনের পোকা।

হ্রদ : এক ধরনের জলাশয়।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা?

খ. লেখাটির মধ্যে কী কী বিশ্লেষণ আছে?

গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী অমিল আছে?

ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী অমিল আছে?

ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে?

বলি ও লিখি

'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়

'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' লেখাটির প্রথম অনুচ্ছেদের চারটি বাক্য খেয়াল করো। এখানে প্রথম বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় পরাগায়ন ঘটায় বলে ফল ও ফসল হয়। দ্বিতীয় বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় কমে গেলে ফসলের ফলন কমে যায়। তৃতীয় বাক্যের তথ্য: পোকামাকড় খেয়ে বহু প্রাণী বাঁচে। এরপর তিন বাক্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে চতুর্থ বাক্যে লেখক সিদ্ধান্তে এসেছেন: পোকামাকড় নির্বিচারে মারা ঠিক নয়। এভাবে তথ্য বিশ্লেষণমূলক লেখায় নতুন সিদ্ধান্ত তৈরি হয়।

কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়

উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় যেসব লেখায়, সেগুলোকে উপাত্ত বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে। উপাত্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তথ্য তৈরি হয়।

নিচের ছকে কিছু উপাত্ত আছে। এই ছকে দেশের নাম, বাঘের সংখ্যা এগুলো হলো উপাত্ত। ছকের উপাত্তগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং দলে আলোচনা করো।

দেশের নাম	২০১০ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যা	২০১৫ সালের জরিপে বাঘের সংখ্যা
বাংলাদেশ	৪৪০	১০৬
ভুটান	৭৫	১০৩
কম্বোডিয়া	৫০	০
ভারত	১৭০৬	২২২৬
মিয়ানমার	৮৫	৮৫
নেপাল	১২১	১৯৮
থাইল্যান্ড	২৫২	১৮৯
ভিয়েতনাম	২০	৫

উপরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বহু তথ্যমূলক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন, একটি বাক্য: ভিয়েতনামে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ বাঘ কমেছে। আবার, আরেকটি বাক্য হতে পারে এমন: সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে ভারতে।

এভাবে এই ছকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও কয়েকটি তথ্যমূলক বাক্য রচনা করো।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

৫. ______________________________

৬. ______________________________

৭.

৮. ______________________________

৯. ______________________________

১০. ______________________________

এসব তথ্যমূলক বাক্য ব্যবহার করে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো। শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

বাংলাদেশে মানুষের মুখে মুখে অনেক রূপকথা চালু আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথা সংগ্রহ করে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা এ রকম একটি বইয়ের নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি'। সেখান থেকে একটা গল্প নিচে দেওয়া হলো।

সাত ভাই চম্পা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক রাজার সাত রানি। দেমাকে বড়ো রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটো রানি খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটো রানিকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড়ো রাজ্য কে ভোগ করবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন।

এভাবে দিন যায়। কত দিন পরে—ছোটো রানির ছেলে হবে। রাজার মনে আনন্দ আর ধরে না। রাজার আদেশে পাইক-পেয়াদারা রাজ্যে ঘোষণা দিলেন—'রাজা রাজভান্ডার খুলে দিয়েছেন। মিঠাই-মন্ডা, মণি-মানিক যে যত পারো এসে নিয়ে যাও।'

বড়ো রানিরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল।

রাজা নিজের কোমরে আর ছোটো রানির কোমরে এক সোনার শিকল বেঁধে দিয়ে বললেন, 'যখন ছেলে হবে, এই শিকলে নাড়া দিয়ো, আমি এসে ছেলে দেখব!' এই বলে রাজা রাজদরবারে গেলেন।

ছোটো রানির ছেলে হবে, আঁতুড়ঘরে কে যাবে? বড়ো রানিরা বললেন, 'আহা, ছোটো রানির ছেলে হবে, তা অন্য লোক দেবো কেন? আমরাই যাব।'

বড়ো রানিরা আঁতুড়ঘরে গিয়েই শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভেঙে, ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়ে, মণি-মানিক হাতে রাজা এসে দেখেন—কিছুই না!

রাজা ফিরে গেলেন।

রাজা সভায় বসতে-না-বসতেই আবার শিকলে নাড়া পড়ল।

রাজা আবার ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, এবারও কিছু না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করে বললেন, 'ছেলে না-হতে আবার শিকল নাড়া দিলে আমি সব রানিকে কেটে ফেলব।' এই বলে রাজা চলে গেলেন।

একে একে ছোটো রানির সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হলো। আহা ছেলে-মেয়েগুলো যেন চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করে হাত নাড়ে, পা নাড়ে—আঁতুড়ঘর আলো হয়ে গেল।

ছোটো রানি আস্তে আস্তে বললেন, 'দিদি, কী ছেলে হলো একবার দেখালি না!'

বড়ো রানিরা ছোটো রানির মুখের কাছে রঙ্গ-ভঙ্গি করে হাত নেড়ে, নথ নেড়ে বলে উঠল, 'ছেলে না, হাতি হয়েছে—ওর আবার ছেলে হবে!—কয়টা ইঁদুর আর কয়টা কাঁকড়া হয়েছে।'

শুনে ছোটো রানি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

নিষ্ঠুর বড়ো রানিরা আর শিকলে নাড়া দিলো না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা এনে, ছেলে-মেয়েগুলিকে তাতে পুরে, পাঁশগাদায় পুঁতে ফেলে এলো। এসে, তারপর শিকল ধরে টান দিলো।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য দিয়ে, মণি-মানিক হাতে এলেন। বড়ো রানিরা হাত মুছে, মুখ মুছে তাড়াতাড়ি করে কতকগুলি ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা এনে দেখাল। দেখে রাজা আগুন হয়ে ছোটো রানিকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন।

বড়ো রানিদের মুখে আর হাসি ধরে না; পায়ের মলের বাজনা থামে না, সুখের কাঁটা দূর হলো; রাজপুরীতে আগুন দিয়ে, ঝগড়া-কোন্দল সৃষ্টি করে ছয় রানিতে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

পোড়াকপালী ছোটো রানির দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী-নালা শুকায়—ছোটো রানি ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। রাজার মনে সুখ নেই, রাজার রাজ্যে সুখ নেই—রাজপুরী খাঁখাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না।

একদিন মালি এসে বলল, ‘মহারাজ, ফুল তো ফোটে না। তবে আজ পাঁশগাদার উপরে সাতটি চাঁপা গাছে ও একটি পারুল গাছে টুলটুলে সাতটি চাঁপা ফুল আর একটি পারুল ফুল ফুটে রয়েছে।’

রাজা বললেন, ‘তবে সেই ফুল আনো।’

মালি ফুল আনতে গেল।

মালিকে দেখে পারুল গাছে পারুল ফুল চাঁপা ফুলগুলোকে ডেকে বলল, ‘সাত ভাই চম্পা জাগো রে!’

অমনি সাত চাঁপা নড়ে উঠে সাড়া দিল—‘কেন বোন পারুল ডাকো রে?’

পারুল বলল, ‘রাজার মালি এসেছে, ফুল দেবে কি না দেবে?’

সাত চাঁপা তুরতুর করে উপরে উঠে গিয়ে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল, ‘না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজা, তবে দেবো ফুল!’

দেখে শুনে মালি অবাক হয়ে গেল। ফুলের সাজি ফেলে দৌড়ে গিয়ে রাজার কাছে খবর দিলো।

আশ্চর্য হয়ে রাজা আর রাজসভার সবাই সেখানে এলেন।

রাজা এসে ফুল তুলতে গেলেন, অমনি পারুল ফুল চাঁপা ফুলদের ডেকে বলল, ‘সাত ভাই চম্পা জাগো রে!’

চাঁপারা উত্তর দিলো, ‘কেন বোন পারুল ডাকো রে?’

পারুল বলল, ‘রাজা নিজে এসেছেন, ফুল দেবে কি না দেবে?’

চাঁপারা বলল, ‘না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজার বড়ো রানি, তবে দেবো ফুল!’ এই বলে চাঁপা ফুলেরা আরও উঁচুতে উঠল।

রাজা বড়ো রানিকে ডাকালেন। বড়ো রানি মল বাজাতে বাজাতে এসে ফুল তুলতে গেলেন। চাঁপা ফুলেরা বলল, ‘না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, আগে আসুক রাজার মেজো রানি, তবে দেবো ফুল!’

তারপর মেজো রানি এলেন, সেজো রানি এলেন, নোয়া রানি এলেন, কনে রানি এলেন, কেউই ফুল পেলেন না। ফুলেরা গিয়ে আকাশে তারার মতো ফুটে রইল।

রাজা গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

শেষে দুয়ো রানি এলেন; তখন ফুলেরা বলল, ‘না দেবো না দেবো ফুল, উঠব শতেক দূর, যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী, তবে দেবো ফুল।’

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। রাজা চৌদোলা পাঠিয়ে দিলেন, পাইক-বেহারারা চৌদোলা নিয়ে মাঠে গিয়ে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটো রানিকে নিয়ে এল।

ছোটো রানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড়, তাই নিয়ে তিনি ফুল তুলতে গেলেন। অমনি সুড়সুড় করে চাঁপারা আকাশ থেকে নেমে এল, পারুল ফুলটি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। ফুলের মধ্য থেকে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র আর এক রাজকন্যা ‘মা’ ‘মা’ বলে ডেকে ঝুপঝুপ করে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটো রানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল। বড়ো রানিরা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

রাজা তখনি বড়ো রানিদের কঠিন শাস্তি দিয়ে সাত রাজপুত্র, পারুল-রাজকন্যা আর ছোটো রানিকে নিয়ে রাজপুরীতে গেলেন। রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বেজে উঠল।

(পরিমার্জিত)

শব্দের অর্থ

আঁতুড়ঘর :	যে ঘরে শিশুর জন্ম হয়।
কাঁখ :	কোমর।
ঘুঁটে :	শুকনা গোবর।
ঘুঁটে-কুড়ানি :	ঘুঁটে কুড়ায় যে।
চৌদোলা :	পালকি।
জয়ডঙ্কা :	বড়ো ঢাক।
দেমাক :	অহংকার।
নথ :	নাকে পরার অলংকার।
পাইক :	লাঠিয়াল।
পাঁশগাদা :	ছাইয়ের স্তূপ।
পেয়াদা :	সংবাদবাহক।
বেহারা :	পালকিবাহক।
মল :	পায়ের অলংকার।
রাজভান্ডার :	কোষাগার।
হাঁড়ি-সরা :	হাঁড়ি ও তার ঢাকনা।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. আগে এ ধরনের আর কোন গল্প পড়েছ? ____________________

____

খ. ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে কী কী চরিত্র আছে? ____________________

____

গ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবে হয় না? ____________________

____

ঘ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবেও ঘটতে পারে? ____________________

____

ঙ. এই গল্প পড়ে আমরা কী বুঝলাম? ____________________

____

বলি ও লিখি

'সাত ভাই চম্পা' গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

বিভিন্ন রকম কল্পকাহিনি

এমন কিছু গল্প আছে যেগুলোর মধ্যে অনেক ঘটনা বাস্তবের সাথে মেলে না। এগুলোকে কাল্পনিক গল্প বা কল্পকাহিনি বলে। কল্পকাহিনি পড়তে বা শুনতে আমাদের ভালো লাগে, অনেক কিছু জানাও যায়। নিচে তিন ধরনের কল্পকাহিনির পরিচয় দেওয়া হলো।

রূপকথা: রূপকথা এক ধরনের শিশুতোষ গল্প, যেখানে মানুষের পাশাপাশি রাক্ষস-দৈত্য, ডাইনি-পরি, ভূত-পেতনি ইত্যাদি কাল্পনিক চরিত্র থাকে।

উপকথা: মূলত পশু-পাখি নিয়ে রচিত গল্পকে উপকথা বলে। উপকথার পশু-পাখিরা মানুষের মতো আচরণ করে।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি: বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা কাল্পনিক গল্পকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলে।

সাহিত্য পড়ি লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

কবিতা পড়ি ১

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সব বয়সের মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা ও গান রচনা করতে পারতেন। নিচে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা দেওয়া হলো।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

আমি সাগর পাড়ি দেবো

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার 'লাল বাওটা' তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরি বোঝাই করে দেবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজরানা।
চারপাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

আসবে হাঙর কুমির তিমি—কে করে তায় ভয়;
বলব, 'ওরে, ভয় পায় যে—এ সে ছেলেই নয়।'
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, আমি বণিক বীর,
খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজি মাল্লামাঝি, নৌ-সেনা ঐ জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে।
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখব নাকো আর,
বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে নেবো,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো।
বলব মাকে, 'ভয় কী গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাই তো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব—ঢাকব মা এ লাজ।
লাল জহরত পান্নাচুনি মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানি।

শব্দের অর্থ

খাজনা :	কর।
গাংচিল :	পাখির নাম।
চুনি :	মূল্যবান পাথর।
জলদস্যু :	যারা সমুদ্রে ডাকাতি করে।
জহরত :	মূল্যবান পাথর।
তরি :	নৌকা।
থানা :	আস্তানা।
দন্ত :	দাঁত।
নখর :	নখ।
নজরানা :	উপহার।
নীর :	পানি।
নৌ-সেনা :	নৌবাহিনীর সদস্য।
পাড়ি দেওয়া :	পার হওয়া।
পান্না :	মূল্যবান পাথর।
বণিক :	ব্যবসায়ী।
বাণিজ্য :	ব্যবসা।
বিভেদ :	পার্থক্য।
ময়ূরপঙ্খি বজরা :	সামনের দিকে ময়ূরের আকৃতিযুক্ত বড়ো নৌকা।
মরাল :	রাজহাঁস।
লাল বাওটা :	লাল রঙের পাল।
সওদাগর :	বড়ো ব্যবসায়ী।
সপ্ত মধুকর :	বাণিজ্যতরির নাম।
সিন্ধু :	সাগর।
সিন্ধু-গাজি :	সাগরের বীর।
সুধা :	এক ধরনের পানীয়।
শুক্তি :	ঝিনুক।
হাতছানি :	হাত দিয়ে ইশারা করা।
সওদা :	পণ্য।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। এই কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

মিল-শব্দ খুঁজি

ছড়া-কবিতায় এক লাইনের শেষ শব্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকে। যেমন: সওদাগর-মধুকর, ঘাটে-হাটে, তুলে-দুলে ইত্যাদি। তোমরাও এভাবে মিল-শব্দ তৈরি করতে পারো। নিচে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলোর এক বা একাধিক মিল-শব্দ লেখো।

শব্দ	মিল-শব্দ
১. ঘাট	
২. কেনা	
৩. রতন	
৪. দোলা	
৫. তার	
৬. আশা	
৭. দেশ	
৮. ভয়	
৯. হাজার	
১০. তোর	
১১. করব	
১২. দেয়াল	

এভাবে যে কোনো শব্দের মিল-শব্দ তৈরি করা যায়। তোমরা এবার জোড়ায় জোড়ায় মিল-শব্দের খেলা খেলতে পারো। একজন উপরের বারোটি শব্দের বাইরে যে কোনো একটি শব্দ বলবে; অন্যজন সেটির মিল-শব্দ বানাবে।

কবিতা পড়ি ২

জসীমউদ্‌দীন পল্লিকবি নামে পরিচিত। তিনি পল্লির জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। নিচের কবিতাটি তাঁর 'হাসু' নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

আমার বাড়ি

জসীমউদ্‌দীন

আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেবো পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেবো
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেবো
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরি কলা
গামছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।
গাই দোহনের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।
আমার বাড়ি ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দিঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর
এই বরাবর পথ,
মৌরি ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

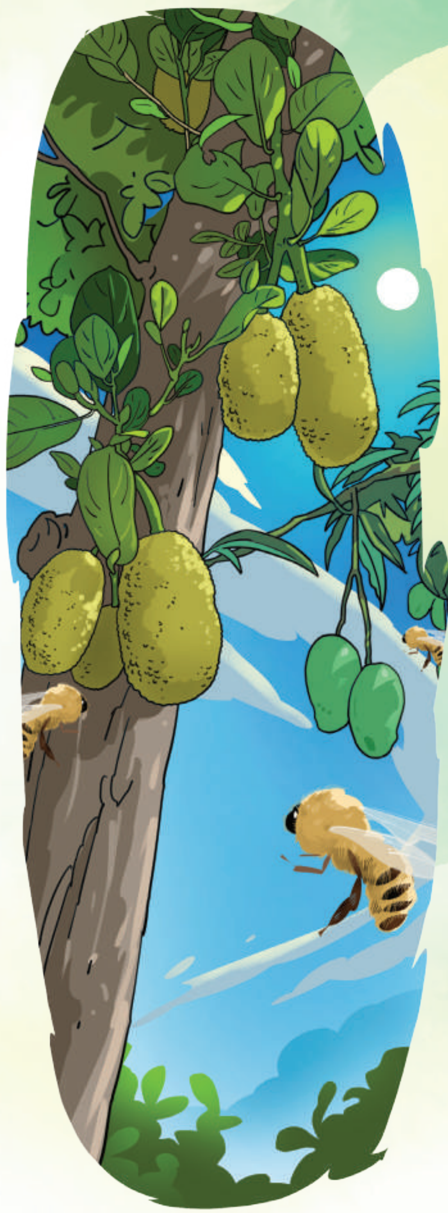

শব্দের অর্থ

আঁচল : শাড়ির শেষ ভাগ।

কবরি কলা : দেশি জাতের কলা।

কাজলা দিঘি: যে দিঘির পানি দেখতে কালো মনে হয়।

গাই দোহন : গোরুর দুধ দোয়ানো।

গামছা-বাঁধা দই : জমাট দই।

জলপান : হালকা নাশতা।

তব : তোমার।

পিঁড়ে : কাঠের তৈরি ছোটো ও নিচু আসন।

বিন্নি ধান : ধানের নাম।

ভোমর : ভ্রমর; মধুপায়ী এক রকমের পোকা।

মৌরি ফুল : ফুলের নাম।

রথ : এক ধরনের বাহন।

শালি ধান : ধানের নাম।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। 'আমার বাড়ি' কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

'আমার বাড়ি' কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'আমার বাড়ি' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

কবিতায় শব্দের পরিবর্তন

কবিতায় অনেক সময়ে শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে কবিরা সাধারণত এটি করে থাকেন। 'আমার বাড়ি' কবিতা থেকে এমন কিছু শব্দের তালিকা দেওয়া হলো:

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
যাইও	যেয়ো
ভোমর	ভ্রমর
পিঁড়ে	পিঁড়ি
চিঁড়ে	চিঁড়া
শুয়ো	শুয়ে থেকো
পাতি	পেতে
শব্দ শুনি	শব্দ শুনে
লয়ে	নিয়ে
ভাসি	ভেসে
তব	তোমার

কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর

কবিতায় যে বর্ণনা থাকে, তাকে গদ্যে রূপান্তর করা যায়। 'আমার বাড়ি' কবিতা থেকে এ রকম একটি বিবরণ তৈরি করা হলো:

বন্ধু, তুমি আমার বাড়িতে বেড়াতে এসো। বসার জন্য তোমাকে পিঁড়ি পেতে দেবো। নাশতা হিসেবে শালি ধানের চিঁড়া ও বিন্নি ধানের খই দেবো। সাথে দেবো কবরি কলা আর গামছা-বাঁধা দই। আম-কাঁঠাল ঘেরা গাছের ছায়ায় আঁচল পেতে শুয়ে থেকো। গাছের শাখা দুলিয়ে তোমাকে বাতাস করব। সকালবেলা তোমার ঘুম ভাঙবে গোরুর দুধ দোয়ানোর শব্দ শুনে। সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব। আমার বাড়ির ডালিম গাছে ডালিম ফুল ফোটে। কাজলা দিঘির জলে হাঁস সাঁতার কাটে। আমার বাড়িতে যাওয়ার সোজা রাস্তা আছে; যেখানে মৌরি ফুল ফোটে, সেখানে গিয়ে তোমার গাড়ি থামিয়ো।

কবিতা পড়ি ৩

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের প্রধান কবিদের একজন। তিনি ছোটোদের জন্য কয়েকটি কবিতার বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে আছে ‘এলাটিং বেলাটিং’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো’, ‘গোলাপ ফোটে খুকির হাতে’, ‘রংধনুর সাঁকো’ ইত্যাদি। নিচের ‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটি কবির ‘রংধনুর সাঁকো’ নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

বাঁচতে দাও

শামসুর রাহমান

এই তো দ্যাখো ফুলবাগানে গোলাপ ফোটে,
ফুটতে দাও।
রঙিন কাটা ঘুড়ির পিছে বালক ছোটে
ছুটতে দাও।
নীল আকাশের সোনালি চিল মেলছে পাখা,
মেলতে দাও।
জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রোজই,
খেলতে দাও।
মধ্য দিনে নরম ছায়ায় ডাকছে ঘুঘু,
ডাকতে দাও।
বালির ওপর কত্ত কিছু আঁকছে শিশু
আঁকতে দাও।
কাজল বিলে পানকৌড়ি নাইছে সুখে,
নাইতে দাও।
গহিন গাঙে সুজন মাঝি বাইছে নাও,
বাইতে দাও।

নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ জুড়েছে,
নাচতে দাও।
শিশু, পাখি, ফুলের কুঁড়ি—সবাইকে আজ
বাঁচতে দাও।

শব্দের অর্থ

কাজল বিল :	যে বিলের পানি কালো দেখায়।	**নাইতে :**	গোসল করতে।
কাটা ঘুড়ি :	যে ঘুড়ির সুতা ছিঁড়ে গেছে।	**পানকৌড়ি :**	কালো রঙের মাছ-শিকারি পাখি।
গহিন গাঙ :	বিশাল নদী।	**শ্যামা :**	পাখির নাম।
জোনাক :	জোনাকি।	**সুজন মাঝি :**	দরদি মাঝি।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। 'বাঁচতে দাও' কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

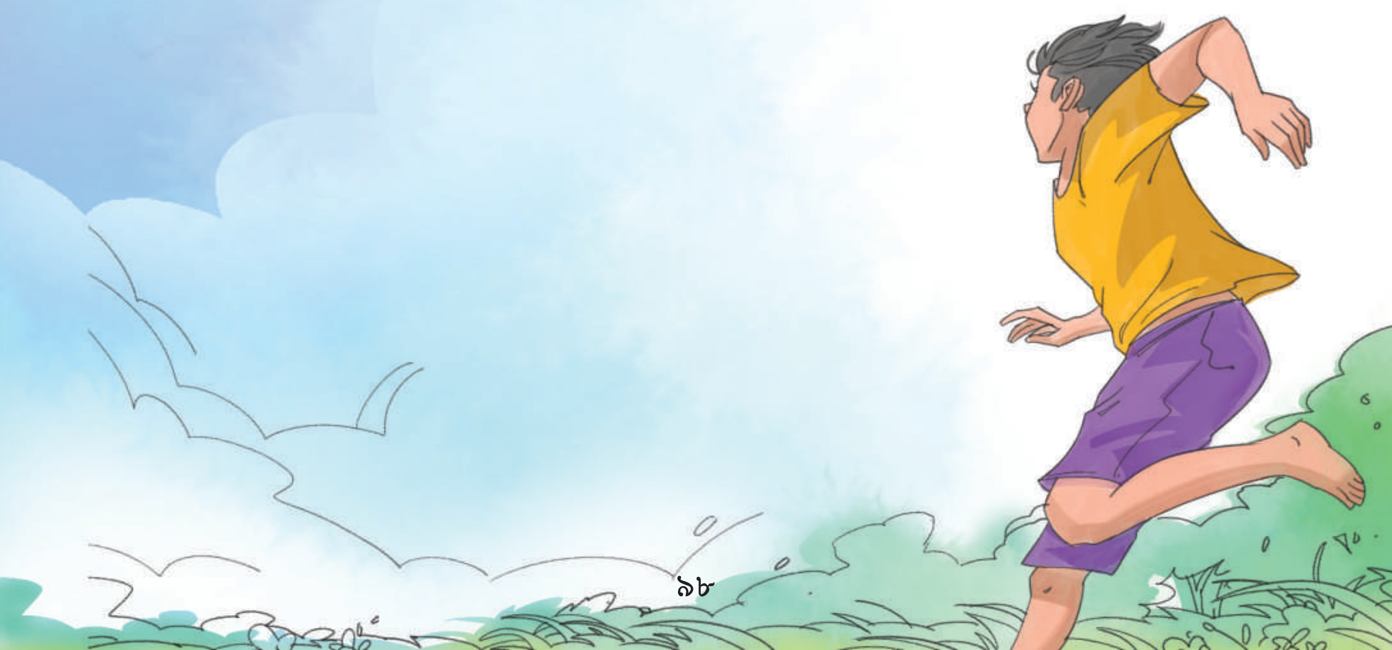

বুঝে লিখি

'বাঁচতে দাও' কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'বাঁচতে দাও' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

তালে তালে পড়ি

'বাঁচতে দাও' কবিতাটি সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। যেখানে যেখানে তালি পড়ছে, সেখানে সেখানে বাঁকা দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। পড়ার সময়ে এটা খেয়াল করো।

/এই তো দ্যাখো /ফুলবাগানে /গোলাপ ফোটে, /ফুটতে দাও।

/রঙিন কাটা /ঘুড়ির পিছে /বালক ছোটে,/ছুটতে দাও।

/নীল আকাশের /সোনালি চিল /মেলছে পাখা, /মেলতে দাও।

/জোনাক পোকা /আলোর খেলা /খেলছে রোজই, /খেলতে দাও।

/মধ্য দিনে /নরম ছায়ায় /ডাকছে ঘুঘু, /ডাকতে দাও।

/বালির ওপর /কত্ত কিছু /আঁকছে শিশু /আঁকতে দাও।

/কাজল বিলে /পানকৌড়ি /নাইছে সুখে, /নাইতে দাও।

/গহিন গাঙে /সুজন মাঝি /বাইছে নাও, /বাইতে দাও।

/নরম রোদে /শ্যামা পাখি /নাচ জুড়েছে, /নাচতে দাও।

/শিশু, পাখি, /ফুলের কুঁড়ি—/সবাইকে আজ /বাঁচতে দাও।

কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

উপরে তিনটি কবিতা পড়েছ। এই কবিতাগুলোর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

কবিতা কী

মনের ভাব সুন্দর ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্যে যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কবিতা বলে। কবিতায় সাধারণত পরপর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে। কবিতা তালে তালে পড়া যায়। কবিতায় লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হয়। কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা। অনেক সময়ে শব্দের চেহারাতেও কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের কবি বলে।

কবিতা লিখি

যে কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যায়। মনের কোনো একটা ভাব বা আবেগ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই ভাব বা আবেগ সুখের হতে পারে, দুঃখের হতে পারে, বিস্ময়ের হতে পারে, এমনকি কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসারও হতে পারে। যেমন—কোনো ঘটনা যদি তোমাকে আনন্দ দেয়, কোনো কিছু হারানোর বেদনা যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, কিছু দেখে যদি তুমি অবাক হও বা বিস্মিত হও, কিংবা যে কোনো কিছুর জন্য যদি তুমি ভালোবাসা অনুভব করো, তবে সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারো।

নিচে কিছু ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। এই ফাঁকা জায়গায় তুমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে একটি কবিতা লেখো। কবিতাটি হতে পারে চার, আট বা বারো লাইনের। কবিতা লেখার সময়ে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। কবিতার একটি নাম দাও।

যাচাই করি

তোমার লেখা কবিতায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. পরপর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।
২. তালে তালে পড়া যায় কি না।
৩. লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কি না।
৪. এর ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা কি না।
৫. শব্দের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

একজনের লেখা কবিতা অন্যকে পড়তে দাও। প্রত্যেকের কবিতা নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করো।

২য় পরিচ্ছেদ

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সেরা কবি। তিনি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক-সহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় অবদান রেখেছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

তোমাদের পড়ার জন্য নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান দেওয়া হলো। গানটি তাঁর 'রাজা' নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমরা সবাই রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা।

আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তারি পথে।
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।—
আমরা সবাই রাজা॥

শব্দের অর্থ

চরি: ঘুরে বেড়াই।

ত্রাস: ভয়।

দাসত্ব: পরাধীনতা।

বিফলতা: ব্যর্থতা।

বিষম আবর্ত: ভীষণ ঘূর্ণিপাক।

মোদের: আমাদের।

রাজত্ব: রাজ্য।

সনে: সাথে।

স্বত্ব: অধিকার।

গান গাই

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী 'আমরা সবাই রাজা' গানটি সবাই মিলে গাও।

গান বুঝি

উপরের গানে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কিছু প্রশ্ন লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

'আমরা সবাই রাজা' গানটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার সাথে গানের কী কী পার্থক্য আছে, দলে আলোচনা করে বের করো। গানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

গান কী

কোনো একটা ভাব বা বিষয় নিয়ে গান রচিত হয়। কবিতার মতো গানও তাল দিয়ে পড়া যায়। গানেও এক লাইনের শেষ শব্দের সঙ্গে পরের লাইনের শেষ শব্দে মিল থাকে। তবে কোনো একটা মিল গানের মধ্যে বারে বারে ফিরে আসে।

কবিতা আবৃত্তি করা হয়; গান গাওয়া হয়। গানের সুর ও তাল ঠিক রাখার জন্য নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর মধ্যে সুর ঠিক রাখার জন্য হারমোনিয়াম, পিয়ানো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়; অন্যদিকে তাল ঠিক রাখার জন্য তবলা, ঢোল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

যিনি গান লেখেন, তাঁকে বলা হয় গীতিকার। যিনি গানে সুর দেন, তাঁকে বলা হয় সুরকার। আর যিনি গান গেয়ে শোনান, তাঁকে বলা হয় গায়ক বা শিল্পী।

৩য় পরিচ্ছেদ

গল্প

গল্প পড়ি ১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'প্রাগৈতিহাসিক' ইত্যাদি। নিচে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

ম্যাজিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বানানো গল্প অনেক বলেছি। আজ একটা সত্য ঘটনার গল্প বলি। আপনা থেকে ঠিক জাদুকরি কৌশলে একটা ম্যাজিক ঘটে যাবার মজার গল্প।

ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ি ফিরলাম, ছেলেমেয়েদের শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানের প্যাসেজে বসে সকলে চা জলখাবার খাচ্ছিল।

টুটুর মা বললেন, মেয়ে কী কাণ্ড করেছে জানো? সোনার চুড়িটা ভেঙে দু-টুকরো করেছে!

টুটু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ইচ্ছা করে ভেঙেছি নাকি? পা পিছলে পড়ে গেলাম তো কী করব? আমার যে ব্যথা লাগল সেটা বুঝি কিছু নয়।

চুড়ি টুটুর মার, মেয়েকে পরতে দিয়েছিলেন। ঘরে আমি জামা ছাড়ছি, টুটুর মা উঠে এসে খাটের বালিশের তলা থেকে বার করে ভাঙা চুড়িটা দেখালেন। সমান দুটো টুকরো হয়ে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, দু-টুকরো হলো কী করে?

—কে জানে!

টুটুর মা টুকরো দুটো আবার বালিশের তলায় গুঁজে দিলেন।

বললাম, সোনাও বালিশের তলায় থাকবে! কাল-পরশু শুনব তো যে হারিয়ে গেছে?

—না না। তোমায় খেতে দিয়ে তুলে রাখব।

আমি ঘরের দরজার কাছে বসলাম। টুটুর মা আমায় খেতে দিলেন।

এবং খুব সম্ভব আমার খোঁচা আর দামি জিনিস হারাবার পুরানো অভিজ্ঞতা খেয়াল করে চুড়ির টুকরো দুটো তুলে রাখতে গেলেন।

প্রথমে বালিশের তলাটা হাতড়ালেন। তারপর তাড়াতাড়ি একটা একটা করে দুটো বালিশ তুলে অবাক হয়ে বললেন, ওমা! কী হলো চুড়িটা?

অবাক হবারই কথা। দু'তিন মিনিট আগে চুড়ির টুকরো দুটো বালিশের তলায় গুঁজে দিয়েছেন, এর মধ্যে আপনা থেকে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সোনার চুড়ি ভেঙে টুকরো হলে তাদের পাখা গজায় নাকি?

বললাম, কী আর হবে, এখানেই আছে। খুঁজে দেখো।

বিছানার চাদর তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে টুটুর মা খুঁজলেন। তারপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর আমিও তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, মেঝেতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে ভেবে খাটের তলা থেকে সমস্ত ঘর ঝাঁট দেওয়ালাম। কিন্তু কোথায় সোনার টুকরো!

তাজ্জব বানিয়ে দেবার মতোই ব্যাপার।বালিশের তলায় টুকরো দুটো রেখে টুটুর মা রান্নাঘরে গেলেন, আমি এসে বসলাম দরজার কাছে। এর মধ্যে কেউ ঘরেও ঢোকেনি, খাটের ধারে-কাছেও যায়নি।

বালিশে চাপা না থাকলেও বরং মনে করা চলত যে এক ফাঁকে জানলা দিয়ে কোনো পাখি ঘরে ঢুকে মুখে করে নিয়ে গেছে, কিম্বা ইঁদুর নিয়ে গেছে।

অদ্ভুত হলেও একটা মানে করা যেত টুকরো দুটোর এভাবে শূন্যে উড়ে যাবার!

টুটুর মা আমায় বললেন, তুমি নিশ্চয় তামাশা করছ! আমি রান্নাঘরে গেছি, সেই ফাঁকে সরিয়ে নিয়েছ।

আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যি নাওনি?

—না।

কাজ সারা জরুরি ছিল। কাজের ঘরে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম—কিন্তু কাজ করব কী! কিছুতেই কাজে মন বসে না। এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটে গেল, তার একটা মানে খুঁজে বার করতে না পারলে কি মানুষের স্বস্তি থাকে!

সোনাটুকু হারিয়েছে, হারাক। কিন্তু বালিশের তলা থেকে কী করে হারাল, না জানলে কি চলে?

কাজ বন্ধ করে কলম রেখে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম। এলোমেলো চিন্তা দিয়ে এ রহস্য ভেদ করা যাবে না। কী করে এ রকম ঘটতে পারে একে একে তার সমস্ত সম্ভবপর কথা ভাবতে হবে।

আমায় দেখিয়ে টুটুর মা যখন টুকরো দুটো আবার বালিশের তলায় রাখতে গেলেন তখন কোনো গোলমাল হয়নি তো?

ভাবতে গিয়েই আমার এমন হাসি পেল! খাটের উপর বিছানা, বিছানার এক মাথায় পাশাপাশি দুটো করে বালিশ—ওয়াড় দেওয়া বালিশ।

বালিশ দুটির তলে টুটুর মার চুড়ির টুকরো দুটি গুঁজে দেওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়েই রহস্য ভেদ হয়ে গেল!

টুটুর মাকে ডেকে বললাম, তোমরা এত খুঁজে পেলে না, আমি এই ঘরে বসে চুড়ি খুঁজে দিচ্ছি।

—কোথায় আছে?

—বালিশের ওয়াড়ের ভেতর খোঁজোগে যাও, পেয়ে যাবে!

সোজা ব্যাপার। তলার বালিশের ওয়াড়ের খোলা মুখের দিকটা ছিল ধারের দিকে। বালিশের তলা মনে করে টুটুর মা টুকরো দুটো রাখতে ওয়াড়ের মধ্যে হাত চালান করে দিয়েছিলেন!

খোঁজা হয়েছিল তন্ন তন্ন করে, শুধু বালিশের ওয়াড় খোঁজার কথা খেয়াল হয়নি। মানুষের সব দিক—খুব সোজা দিক পর্যন্ত—খেয়াল হয় না বলেই ম্যাজিক সম্ভব হয়েছে।

শব্দের অর্থ

ওয়াড়:	বালিশের ঢাকনা।
তন্ন তন্ন করে খোঁজা:	খুব ভালো করে খোঁজা।
তাজ্জব বানিয়ে দেওয়া:	অবাক করে দেওয়া।
তামাশা:	মজা।
পাখা গজানো:	উড়ে যাওয়া।
প্যাসেজ:	ফাঁকা জায়গা।
রহস্য ভেদ হওয়া:	অজানা বিষয় জানতে পারা।
শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া:	অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।
হাত চালান করা:	হাত ঢুকিয়ে দেওয়া।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

'ম্যাজিক' গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'ম্যাজিক' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

গল্প পড়ি ২

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লেখক। তিনি ছোটো ছোটো বাক্যে সহজ-সরল শব্দে প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। 'তোমাদের জন্য রূপকথা', 'নীল হাতি', 'বোতল ভূত', 'কানী ডাইনী' ইত্যাদি তাঁর ছোটোদের জন্য লেখা বই। নিচের গল্পটি হুমায়ূন আহমেদের 'পুতুল' নামের বই থেকে নেওয়া।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

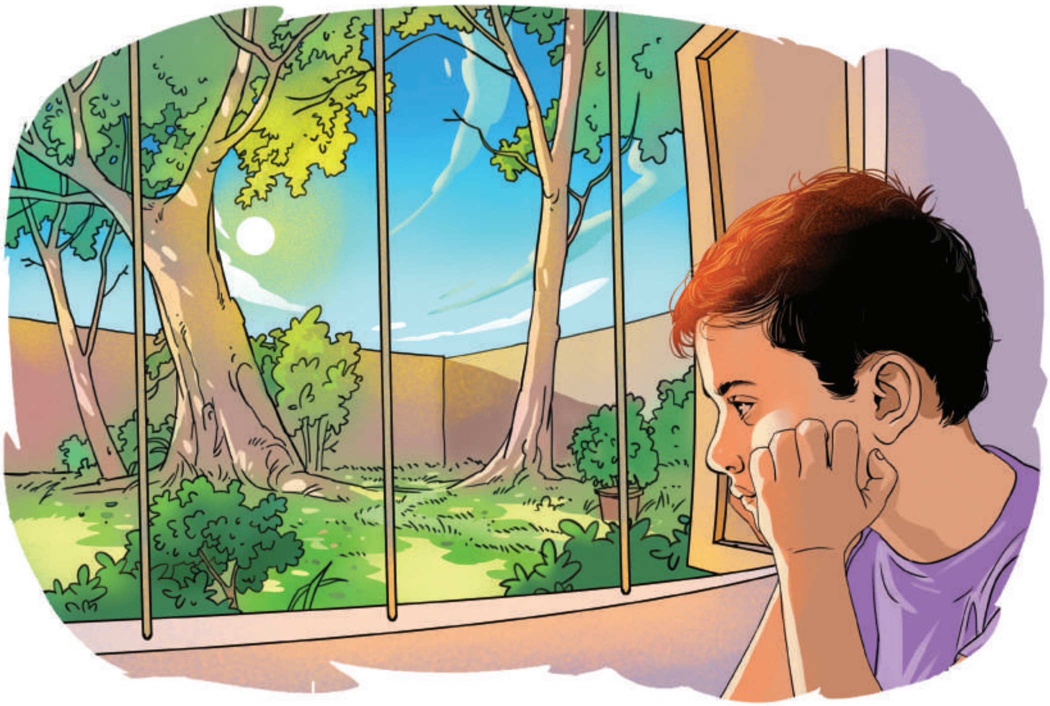

পুতুল

হুমায়ূন আহমেদ

পুতুলের ঘর থেকে তাদের বাগানটা দেখা যায়। এত সুন্দর লাগে তার। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাদের বাগান অন্যদের বাগানের মতো নয়। তিনটা বিশাল বড়ো বড়ো গাছ, একটা রেনট্রি গাছ। এত বড়ো যে মনে হয় এই গাছের পাতাগুলো আকাশে লেগে গেছে। আর দুটো হচ্ছে কদম ফুলের গাছ। কদম ফুলের গাছ দুটি পাশাপাশি যেন দুই জমজ বোন, একজন অন্যজনের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। বর্ষাকালে গাছ দুটিতে কী অদ্ভুত ফুল ফোটে। সোনার বলের মতো ফুল।

পুতুলের মা জেসমিন কদম ফুলের গাছ দুটি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। কারণ হচ্ছে শুঁয়োপোকা। কদম গাছে খুব শুঁয়োপোকা হয়। আর শুঁয়োপোকা দেখলেই জেসমিনের বমি পেয়ে যায়। তিনি প্রতি শীতকালে একবার করে বলেন— গাছগুলো কাটিয়ে ফেলা দরকার। শেষ পর্যন্ত কেন যেন কাটা হয় না। দেখতে দেখতে বর্ষা এসে যায়। অদ্ভুত কদম ফুলগুলো ফোটে। কী যে ভালো লাগে পুতুলের।

এখন শীতকাল। কদিন আগে ঠিক করা হয়েছে বড়ো বড়ো গাছগুলো সব কেটে ফেলা হবে। জেসমিন বজলু মিয়া বলে একটি লোককে ঠিক করেছেন। লোকটির মুখে বসন্তের দাগ। বজলু মিয়া গতকাল এসে বড়ো বড়ো গাছগুলো সব দেখে গেছে। দড়ি দিয়ে কী সব মাপ-টাপও নিয়েছে। বলে গেছে সোমবারে লোকজন নিয়ে আসবে।

পুতুলের এই জন্যেই খুব মন খারাপ। গাছগুলোর দিকে তাকালেই তার কান্না পেয়ে যায়। বাগানে এলেই সে এখন গাছগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কী সব কথা বলে। হয়তো-বা সান্ত্বনার কোনো কথা। আজও তাই করছিল। গাছের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সে লক্ষ করল, তার বাবা বাগানে হাঁটছেন। তাঁর হাতে একটি ভাঁজ-করা খবরের কাগজ। তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন। খুব রেগে গেলে তিনি এ রকম গম্ভীর হয়ে যান। বাগানে কিংবা ছাদে মাথা নিচু করে হাঁটেন। পুতুলের মনে হলো আজ বোধহয় বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। এই একটা খারাপ ব্যাপার। দুদিন পরপর তাঁরা ঝগড়া করেন। ঝগড়া করবে ছোটোরা। আড়ি দেবে— ভাব নেবে। বড়োরা এ রকম করবে কেন?

পুতুল ছোটো ছোটো পা ফেলে রেনট্রি গাছটার দিকে যাচ্ছে। তার চোখ বাবার দিকে। বাবা কতটা রেগে আছেন সে বুঝতে চেষ্টা করছে। পুতুলের বয়স এগারো। এই বয়সের ছেলেরা চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে খুব বুঝতে চেষ্টা করে।

রহমান সাহেব পুতুলকে রেনট্রি গাছটার দিকে যেতে দেখলেন। কিছু বললেন না। তিনি জানেন, এই গাছের নিচে পুতুল প্রায়ই এসে বসে। এটা সম্ভবত পুতুলের কোনো গোপন জায়গা। সব শিশুদের কিছু গোপন জায়গা থাকে। তাঁর নিজেরও ছিল। পুতুলকে দেখে মাঝে মাঝে তাঁর নিজের শৈশবের কথা মনে হয়। তবে তিনি পুতুলের মতো নিঃসঙ্গ ছিলেন না। অনেক ভাইবোনের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। তাঁদের বাড়িটা ছিল হৈ চৈ হুল্লোড়ের বাড়ি। নিজের ভাইবোন ছাড়াও চাচাতো ভাইবোন, ফুপাতো ভাইবোন, পাড়ার ছেলেপেলে। সারাদিন চিৎকার চেঁচামেচি হৈ চৈ।

রহমান সাহেব রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন। বসতে হলো ঘাসে। এমনভাবে বসেছেন যেন পুতুল কী করছে দেখা যায়। তিনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, পুতুল কী করে না—করে খবর রাখতে পারেন না। ছেলেটা খুবই একা। তাকে আরো কিছু সময় দেওয়া দরকার তা তিনি দিতে পারছেন না। তিনি মৃদু গলায় ডাকলেন-পুতুল!

'জি বাবা।'

'কী করছ তুমি?'

'কিছু করছি না।'

'কাছে এসো।'

পুতুল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি লক্ষ করলেন, পুতুলের খালি পা। অথচ তাকে অনেকবার বলা হয়েছে খালি পায়ে বাগানে না আসতে। গায়েও পাতলা একটা শার্ট ছাড়া কিছু নেই। শীতের সকাল বেলা পাতলা একটা জামা পরে কেউ থাকে? রহমান সাহেব খুব বিরক্ত হলেন। বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। ছেলেটা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এ রকম হাসিমুখের একটি ছেলেকে ধমক দিতে মায়া লাগে।

'তুমি প্রায়ই ওই রেনট্রি গাছটার নিচে বসে কী করো ওখানে?'

'কিছু করি না। বসে থাকি।'

'কিছু নিশ্চয়ই করো। শুধু শুধু কি কেউ বসে থাকে?'

পুতুল লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। তার হাসি বলে দিচ্ছে সে শুধু শুধু বসে থাকে না। রহমান সাহেব বললেন, 'বসে বসে ভাবো তাই না?'

'হ্যাঁ ভাবি।'

'কী নিয়ে ভাবো?'

পুতুল উত্তর না দিয়ে আবার লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। রহমান সাহেবের ইচ্ছে করল ছেলেটাকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। মাথা-ভরতি রেশমের মতো চুল। দেখলেই হাত বোলাতে ইচ্ছে করে।

'আজ তোমার শরীর কেমন?'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো সেটা বলো—খুব ভালো, না অল্প ভালো—নাকি মন্দের ভালো।'

'খুব ভালো!'

'আচ্ছা ঠিক আছে। যাও—যা করছিলে করো।'

পুতুল গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। মনে হচ্ছে তার কিছু বলার আছে। কিছু বলতে চাচ্ছে অথচ বলতে পারছে না। রহমান সাহেবের খানিকটা মন খারাপ হলো। এ তো বাচ্চা একটা ছেলে, সে কেন মনের কথাগুলো সহজভাবে বাবা-মাকে বলতে পারবে না। তিনি নরম গলায় বললেন, 'পুতুল তুমি কি কিছু বলতে চাও?'

পুতুল মাথা নাড়ল। সে বলতে চায়। রহমান সাহেব বললেন—'কী বলতে চাও বাবা?'

— গাছগুলো কেন কাটবে?

— গাছ কাটা তোমার পছন্দ নয়?

— না।

— ছোটোরা অনেক কাজ করে যেগুলো বড়োরা পছন্দ করে না। আবার ঠিক তেমনি বড়োরা অনেক কাজ করে যা ছোটোরা পছন্দ করে না। গাছগুলোতে শুঁয়োপোকা হয়, তোমার মা এই পোকাটা সহ্য করতে পারেন না।

পুতুল চুপ করে রইল। রহমান সাহেব বললেন— 'তাছাড়া আরেকটা কারণও আছে। গাছগুলোর জন্য ঘরে আলো-হাওয়া তেমন ঢুকতে পারে না। এখন দেখবে প্রচুর রোদ আসবে।'

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

		রেনট্রি :	শিরীষ গাছ।
অন্যমনস্ক :	আনমনা।	**লাজুক :**	লজ্জিত।
আড়ি দেওয়া :	অভিমান করা।	**শুঁয়োপোকা :**	সারা গায়ে লোমযুক্ত এক ধরনের পোকা।
গম্ভীর :	চুপচাপ।	**শৈশব :**	অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।
বসন্ত :	রোগের নাম।	**হুল্লোড় :**	হুড়াহুড়ি।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘পুতুল’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'পুতুল' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

গল্পের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

গল্প কী

গল্প এক ধরনের গদ্য রচনা, যেখানে কাহিনি ও চরিত্র থাকে। গল্পের কাহিনি সাধারণ ঘটনার চেয়ে একটু ভিন্ন হয়। এই কাহিনি বাস্তব জীবনে ঘটে এমন হতে পারে, আবার কল্পিতও হতে পারে। এদিক দিয়ে গল্প দুই ধরনের: বাস্তবের সাথে মিল আছে এমন গল্প এবং কাল্পনিক বিষয় নিয়ে রচিত গল্প। গল্প বইয়ের মতো বড়ো হয় না; অনেকগুলো গল্প নিয়ে একটা বই হতে পারে। যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের গল্পকার বলে।

গল্প লিখি

নিচের ফাঁকা জায়গায় বানিয়ে বানিয়ে তুমি একটি গল্প লেখো। লেখার সময়ে গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। গল্পটির একটি নাম দাও।

যাচাই করি

তোমার লেখা গল্পে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. কাহিনি আছে কি না।
২. চরিত্র আছে কি না।
৩. সংলাপ আছে কি না।
৪. গদ্যভাষায় লেখা কি না।
৫. এর কাহিনি সাধারণ ঘটনার চেয়ে ভিন্ন কি না।

•৪র্থ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ পড়ি

কামরুল হাসান বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। তিনি 'পটুয়া কামরুল হাসান' নামে পরিচিত ছিলেন। নিচের প্রবন্ধটি কামরুল হাসানের লেখা। এটি তাঁর 'আমাদের লোককৃষ্টি' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

আমাদের লোকশিল্প

কামরুল হাসান

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্য এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এক কালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েক শ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল।

এক সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। একেকটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতে কমপক্ষে ছয় মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একেকটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামে জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্তচালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্তু বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানা রকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এ দেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল ইত্যাদি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে।

বাঁশের নানা রকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটোখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া শোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

(পরিমার্জিত)

শব্দের অর্থ

অনায়াসে : সহজে।

অপরিহার্য : আবশ্যিক।

অমূল্য : মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।

ঐতিহ্য : অতীত কালের গৌরবের বস্তু।

খোদাই করা : খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঁকা।

ঘড়া : কলসি।

জীবনগাথা : জীবনের গল্প।

টেকসই : মজবুত।

টোপর : মাথার মুকুট।

ঠিলা : মাটির কলসি।

দারিদ্র্য : গরিব অবস্থা।

নিবিড় : ঘনিষ্ঠ।

পণ্য : বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।

প্রতীকধর্মী : যা কোনো বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

ফরমাশকারী : যিনি আদেশ করেন।

মৌসুম : কাল, ঋতু।

রেওয়াজ : প্রচলন।

লোকশিল্প : হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী।

শহরতলি : শহরের কাছাকাছি এলাকা।

সংরক্ষণ : রক্ষা করা।

সম্প্রসারণ : প্রসারিত করা।

সহজাত : স্বাভাবিক।

সানকি : মাটির থালা।

সুপরিকল্পিত : ভালোভাবে পরিকল্পনা করা।

সুরুচিপূর্ণ : রুচিশীল।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা : সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা।

হস্তচালিত : হাতে চালানো।

প্রবন্ধ বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের প্রবন্ধে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

উপরে একটি প্রবন্ধ পড়েছ। প্রবন্ধের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

প্রবন্ধ কী

গদ্যভাষায় কোনো বিষয়ের সুবিন্যস্ত আলোচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ অনেক রকমের হয়; যেমন: বিবরণমূলক প্রবন্ধ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ অনেকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। অনুচ্ছেদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। কী বিষয়ে আলোচনা হবে শুরুর অনুচ্ছেদে তার ইঙ্গিত থাকে; শেষ অনুচ্ছেদে লেখকের মতামত ও সিদ্ধান্ত থাকে। যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের প্রাবন্ধিক বলে।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়। প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ লিখি

কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করো। বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবে, তা নিয়ে ভাবো। কয়েকটি অনুচ্ছেদে গদ্যভাষায় তোমার ভাবনাকে উপস্থাপন করো। লেখার শুরুতে ভূমিকা ও লেখার শেষে উপসংহার থাকবে। মাঝখানের অনুচ্ছেদগুলোতে তোমার বক্তব্য একের পর এক সাজিয়ে লিখবে। একেবারে উপরে প্রবন্ধের একটি শিরোনাম লেখো।

যাচাই করি

তোমার লেখা প্রবন্ধে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. গদ্যভাষায় রচিত কি না।
২. নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে লেখা কি না।
৩. ভূমিকা আছে কি না।
৪. উপসংহার আছে কি না।
৫. তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো কি না।

●৫ম পরিচ্ছেদ

নাটক

আবার পড়ি

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ থেকে ‘সুখী মানুষ’ নাটকটি আবার পড়ো।

নাটক বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘সুখী মানুষ’ নাটকে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘সুখী মানুষ’ নাটকটির কাহিনি প্রথমে গল্পের মতো করে বলো, তারপর লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'সুখী মানুষ' নাটকের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

নাটকের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		

নাটক কী

অভিনয়ের উপযোগী করে লেখা সংলাপ-নির্ভর রচনাকে নাটক বলে। নাটকে একজন অন্যজনের সাথে যেসব কথা বলে, সেগুলোকে সংলাপ বলে। আর সংলাপ যাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তাদের বলে চরিত্র। সংলাপের মাধ্যমে নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায়। যাঁরা নাটক লেখেন তাঁদের নাট্যকার বলে।

নাটকে বিভিন্ন ভাগ থাকে; একে বলে দৃশ্য। নাটক যেখানে অভিনয় করা হয়; সেই জায়গাকে বলে মঞ্চ। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের বলে অভিনেতা।

অভিনয় করি

শিক্ষকের নির্দেশনায় ‘সুখী মানুষ’ নাটকটির অভিনয় করো।

০৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের নানা রূপ

কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। নিচের ছকে তুলনা করার জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আছে। টিকচিহ্ন অথবা ক্রসচিহ্ন দেওয়ার মাধ্যমে তোমরা ছকটি পূরণ করো। এর ফলে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ					
২	তাল					
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন					
৪	সুর					
৫	পদ্য-ভাষা					
৬	গদ্য-ভাষা					
৭	কাহিনি					
৮	চরিত্র					
৯	বিষয়					
১০	অনুচ্ছেদ					
১১	সংলাপ					
১২	অভিনয়					

সাহিত্যের রূপ বুঝি

উপরের ছকটি পূরণের মাধ্যমে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—এগুলোর যেসব বৈশিষ্ট্য পেয়েছ, তার ওপর ভিত্তি করে নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখো।

কবিতা

গান

গল্প

প্রবন্ধ

নাটক

দেয়াল-পত্রিকা বানাই

আগের পরিচ্ছেদগুলোতে তোমরা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে শিখেছিলে। তখন তোমরা যেসব গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ বানিয়ে বানিয়ে লিখেছিলে, সেগুলো নিয়ে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো। এ কাজের জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দল থেকে একটি করে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি হবে।

জেনে বুঝে আলোচনা করি

•১ম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন করতে শেখা

ছবি দেখে প্রশ্ন করি

নিচের ছবিটি হয়তো তুমি আগেও দেখেছ, কিংবা কেউ কেউ হয়তো প্রথম দেখলে। এটি দেখে তোমাদের মনে নানা রকম প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। এই ছবি সম্পর্কে ভালো করে জানার জন্য কী কী প্রশ্ন করা যায়, সেগুলো নিচে লেখো।

প্রশ্ন

একটি নমুনা প্রশ্ন শুরুতে দেওয়া হলো।

১. ছবিটি কোন সময়ের?
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

প্রশ্ন করা শিখি

কোনো বিষয় ভালো করে জানার জন্য নানা রকম প্রশ্ন করতে হয়। প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। তাই প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ প্রশ্ন করতে শেখা দরকার। প্রশ্ন করার কাজে আমরা বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহার করি। যেমন:

কী?	কেন?	কীভাবে?	কে?	কারা?
কার?	কোথায়?	কখন?	কত?	কোন?

পোস্টার দেখে বোঝার চেষ্টা করি

নিচের পোস্টারটি ভালো করে দেখো।

এই পোস্টারে যেসব তথ্য আছে, এর বাইরে আর কী কী তথ্য জানা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো, সেগুলো প্রশ্নের আকারে নিচের ছকে লেখো। উদাহরণ হিসেবে একটি প্রশ্ন নিচে দেওয়া হলো:

জিজ্ঞাসা
১. প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
২.
৩.
৪.
৫.

প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করি

দলে ভাগ হও। নিচে কয়েকটি বিষয় দেওয়া আছে। এর মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একজন শিক্ষার্থী দলের অন্যদের সামনে দু-তিন মিনিট কথা বলবে। তার কথার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্যরা খাতায় টুকে রাখবে। বলা শেষ হলে বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য দলের অন্যরা তাকে নানা রকম প্রশ্ন করবে। সেসব প্রশ্নের জবাবও তারা খাতায় টুকে রাখবে।

- নতুন দেখা কোনো জিনিস, প্রাণী বা জায়গা
- কোনো কিছু রান্নার উপায়
- কোনো কিছু বানানোর পদ্ধতি
- কোথাও যাওয়ার রাস্তা
- এলাকার কোনো বিশেষ ঘটনা
- যাওয়া-আসার পথে নতুন কোনো পরিবর্তন
- দৈনিক পত্রিকার কোনো খবর

প্রশ্নের জবাব থেকে অনুচ্ছেদ লিখি

উপস্থাপিত বিষয় ও প্রশ্নের জবাবে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখাটির একটি শিরোনাম দাও।

•২য় পরিচ্ছেদ

আলোচনা করতে শেখা

ঘটনা নিয়ে চিন্তা করি

আর সব দিনের মতো সেদিনও মিলি, রাতুলরা খেলতে গিয়েছিল। মাঠে এসে দেখতে পেল, কয়েকজন লোক ফিতা নিয়ে মাপজোখ করছে। একজনের হাতে আবার মোটা একটা খাতা। সেখানে কলম দিয়ে কীসব টুকে রাখছে। মিলি অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা, লোকগুলো এখানে কী করছে?'

রাতুল বলল, 'কী করছে, তা তো জানি না!'

অন্যরাও এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

শিমু বলল, 'কাল সন্ধ্যায় বাবা বলছিলেন, এখানে নাকি একটা শিশুপার্ক হবে। নতুন নতুন খেলার ব্যবস্থা থাকবে সেখানে।'

'তবে তো দারুণ হয়!' কয়েকজন একসঙ্গে বলে ওঠে।

মিলি খানিক ভেবে গালে হাত দিয়ে বলে, 'তার মানে, বদলে যাচ্ছে আমাদের খেলার মাঠটা। তাই না?'

রাতুল বলে, 'হ্যাঁ, বদলেই তো যাচ্ছে! তখন হয়তো টিকিট কেটে আমাদের ভিতরে ঢুকতে হবে।'

সুনীল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বলল, 'শিশুপার্ক করতে হলে এখানকার অনেক গাছ কাটতে হবে। আর গাছ কাটলে তো পরিবেশের ক্ষতি হবে।'

'আরে তাইতো! এভাবে তো ভেবে দেখিনি!' শিমু বলল।

চিন্তায় পড়ে গেছে সবাই।

যুক্তি দিয়ে নিজের অবস্থান গ্রহণ করি

উপরের ঘটনা পড়ার পর তোমার কী মনে হচ্ছে? কোনটা হলে ভালো হয়—আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত শিশুপার্ক, নাকি গাছপালায় ভরা খেলার মাঠ? তোমার মতের সমর্থনে যুক্তিগুলো লেখো।

	নতুন শিশুপার্ক	পুরাতন খেলার মাঠ
যুক্তি ১		
যুক্তি ২		
যুক্তি ৩		

বিতর্ক করতে শিখি

শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুটি দলে ভাগ হও। এক দল নতুন শিশুপার্কের পক্ষে এবং আরেক দল পুরাতন খেলার মাঠের পক্ষে কথা বলবে। কথা বলার সময়ে দল দুটি নিজেদের যুক্তি একে একে তুলে ধরো। তখন এক দল আরেক দলের যুক্তি খণ্ডনও করতে পারো। এভাবে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে কথা বলাকে বিতর্ক বলে।

বিতর্ক করার সময়ে নিচের কথাগুলো মনে রাখবে:

১. নিজের কথা ও যুক্তি কাগজে টুকে রাখতে হয়।
২. অন্যের কথা ও যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়।
৩. অন্যের বক্তব্যের দুর্বল অংশ খুঁজে বের করতে হয়।
৪. বিনয়ের সঙ্গে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করতে হয়।
৫. নিজের কথা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলতে হয়।
৬. নিজের পক্ষের যুক্তিগুলো একে একে তুলে ধরতে হয়।
৭. অন্যের কথার মাঝখানে কথা বলা যায় না।

বিতর্ক করি

বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষক তোমাদের জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। এরপর প্রতি জোড়া দলের জন্য একটি করে বিতর্কের বিষয় ঠিক করে দেবেন। বিষয়টির পক্ষে এক দল বলবে এবং বিপক্ষে অন্য দল বলবে। প্রতি দলে একজন দলনেতা থাকবে। কথা বলার সময়ে প্রমিত ভাষার ব্যবহার করতে হবে। যুক্তি, পালটা যুক্তি ও ভাষা-ব্যবহারে পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক বিজয়ী দল ঘোষণা করবেন।

পদ্মা বহুমুখী সেতু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ তারিখে গৌরব ও সক্ষমতার প্রতীক দেশের বৃহত্তম সেতু পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। কোনোরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই স্বপ্নের পদ্মা সেতু। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি। মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়া থেকে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা পর্যন্ত সংযুক্ত এই সেতুটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এর উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ। ৩০ হাজার কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে তৈরি এই সেতুটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি এর উপকারভোগী হবে সারাদেশের মানুষ।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
বাংলা

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য